পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ২৪তম সংখ্যা ৩১ হিজরত ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ৩০ জুন ১৯৯৮ ঈসাব্দ

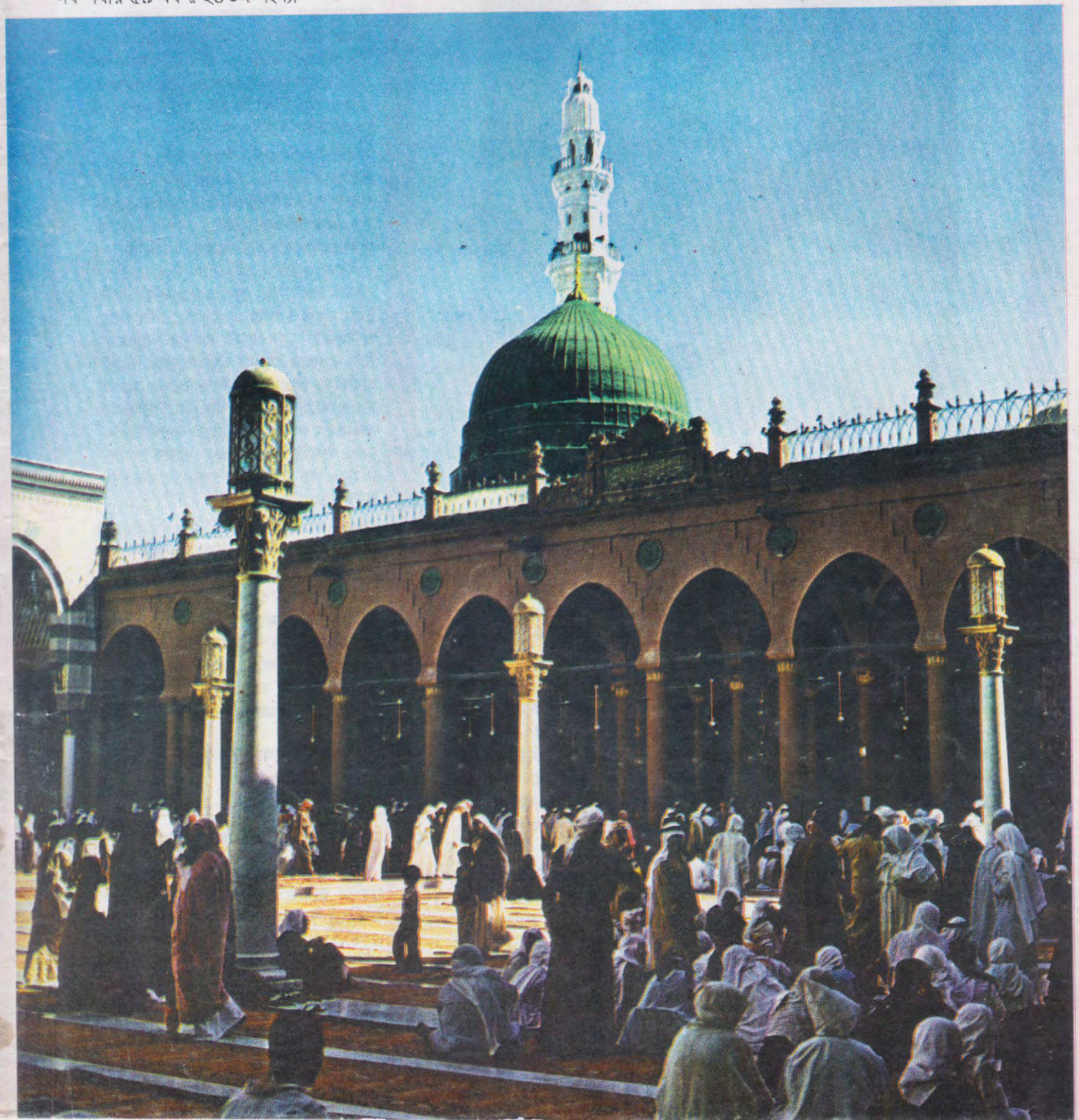

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা ও বর্তমান ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) প্রদত্ত

বাংলাদেশের জন্য শান্তির বাণী

বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর একটি দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়তের বিস্তৃতি হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্র ভয়, হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন শত্রুর প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

অতএব আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে,

(অবশিষ্টাংশ ৪০ পাতায় দ্রষ্টব্য)

রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)

রবিউল আউয়াল মাস দ্বার প্রান্তে। এ মাস বড়ই বরকতের মাস। এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন ও ইন্তেকাল করে স্বীয় প্রভু প্রতিপালকের সন্নিধানে চলে যান। তিনি (সঃ) ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন- সমগ্র বিশ্বের জন্যে কল্যাণস্বরূপ। আমরা তাঁকে (সঃ) মেনেছি। আমরা তাঁর (সঃ) অনুসারী ও অনুগামী। আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে-নিজস্ব ভূবনে রহমতরূপে নিজেদেরকে তৈরী করতে না পারি তাহলে আমরা যে তাঁর (সঃ) উম্মত তা কেবল কথার কথাই থেকে যাবে।

আমরা কীভাবে অন্যের জন্যে রহমত হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারি তা ভেবে দেখা দরকার। বর্তমান অবক্ষয় জর্জরিত বিশ্বে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে পার্থিবতার নেশায় মত্ত। এ নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধার করে আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যাবার জন্যে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর এক গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হিসেবে আবির্ভূত হন ১৪শ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে। তিনি দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের কাজকে পুনঃপ্রবর্তন করেন। আমরা যদি এ কাজে সঠিকভাবে তাঁর (আঃ) সহায়তা করি অর্থাৎ আমরা যদি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকি, কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাই তাহলে আমরাও নিজ নিজ স্থানে রহমত তথা কল্যাণের কারণ হতে পারি।

আহমদী জামাতের প্রত্যেককে দাঈ ইলাল্লাহ্ হতে হবে। নবী করীম (সঃ) আজীবন মানুষকে নেক কাজের দিকে আহ্বান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেছেন। আমরা যদি সেই কাজে কায়মনোবাক্যে ব্রত হই তবেই আমরা নিজ নিজ পরিমন্ডলে রহমত ও কল্যাণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারবো। তবেই আমাদের রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ) -এর অনুসারী হওয়া সার্থক হবে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

২০তম জাতীয় মজলিসে শূরা সুসম্পন্ন

বিগত ১২-১৩ জুন '৯৮ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ২০তম জাতীয় মজলিসে শূরা সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে। এতে ১৯৯৮-৯৯ সনের বাজেট ও কর্ম-পরিকল্পনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হয়।

– আহমদী বার্তা

পাক্ষিক
আহমদী
নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ২৪ তম সংখ্যা

১৬ আষাঢ় ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ৪ রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হিঃ কাঃ
৩০ এহসান ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ জুন ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণভাবে আশিস ও কল্যাণ লাভ করেছেন

বিগত ১২ই জুন তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের 'ইসলাম ও আমরা' শীর্ষক কলামে জনাব সা'দ উল্লাহ্ সাহেব বিরচিত 'আব্রাম-আব্রাহাম-ইব্রাহীম' নামক প্রবন্ধটির নিম্নোক্ত অংশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

"এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ ব্যাপারে জনৈক আব্দুল হক ১৯৯৩ সালে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নামাজের শেষে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়াতো) পাঠ করার পর যে দরূদ পড়া হয় বাংলায় তার মোটামুটি অর্থ হলো ঃ হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর ও তাঁর বংশধরের ওপর আশীর্বাদ পাঠাও, যেরূপ আশীর্বাদ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও জ্ঞানী।

হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর বরকত পাঠাও, যেরূপ বরকত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও অভিজ্ঞ।

"উল্লেখিত দরূদ পাঠ করে আমরা কি এটাই প্রমাণ করি না যে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে যে আশীর্বাদ ও বরকত প্রদান করা হয়েছে, আমাদের নবী ও তাঁর বংশধরদের ওপর আজও তা প্রদান করা হয়নি।

আমাদের নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সকল নবীর নেতা এবং বোধগম্য কারণেই এই বিশ্বাস জন্মাবার কথা যে, তাঁকেই আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী আশীর্বাদ ও বরকত দান করবেন।"

তাঁর প্রশ্ন ছিল ঃ (ক) কে বা কারা দরূদ রচিত করেছে এবং (খ) কোন জমানা থেকে এই দরূদ রচিত ও পঠিত হয়ে আসছে?

আমি আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিনি। বিজ্ঞ আলেমদের অনুরোধ করেছিলাম এ ব্যাপারে আলোকসম্পাত করতে (দ্রঃ জনকণ্ঠ, ১০-৯-৯৩)।

– এ সম্বন্ধে এখনও কেউ আলোকসম্পাত করেননি"।

প্রবন্ধের এ অংশটুকুতে ২টি প্রশ্ন সমাবিষ্ট। একটি জনৈক জনাব আব্দুল হকের এবং অপরটি স্বয়ং লেখকের।

জনাব আব্দুল হকের প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে দরূদ পাঠ করা ফরয। আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমের সূরা আহযাবের ৫৭ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে দরূদ পাঠ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনিও নবী (সঃ)-এর ওপরে দরূদ পাঠ করেন। ফিরিশ্তারাও পাঠ করেন এবং সকল মু'মিনকেও পাঠ করতে আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু-এর এই আদেশের প্রেক্ষিতেই নামাযে আমরা যে তাশাহ্হুদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করি তা রচিত হয়েছে এবং স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় থেকে তাঁর নির্দেশমত মু'মিন সমাজ কর্তৃক ইহা পঠিত হয়ে আসছে। হযূর (সঃ) নিজেও ইহা পাঠ করেছেন। ইহা পাঠ করা ব্যতিরেকে নামায পরিপূর্ণ হয় না। নামাযে দরূদ পাঠের গুরুত্বের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিতন্ডা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্ভবতঃ জনাব সা'দ উল্লাহ্ সাহেবের নিজের। একমাত্র আহমদী জামাতই জোর দিয়ে বলতে পারে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানগণ পরিপূর্ণভাবে দরূদে প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ লাভ করেছেন। আমরা যে দরূদ পাঠ করি তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানগণ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের ন্যায় আশিস ও কল্যাণ প্রদানের জন্যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা হয়ে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈল (আঃ)। ইসহাকের বংশে বহু নবী

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ ঃ উৎকৃষ্টতম আদর্শ মুহাম্মদ (সঃ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ নবী করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী	ঃ সংকলন ও অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ যুগ ইমাম-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ রসূলে আযম (সঃ) পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৪-৫
❑ কবিতা ঃ না'তে রসূল (সঃ)	ঃ অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	৬
❑ জুমুআর খুতবাঃ জামাতী নেযামের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭-১৩
❑ তবলীগের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ	ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	১৪-১৫
❑ হযরত রসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েকজন চিন্তাবিদের অভিমত	ঃ সংগ্রহ– অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১৬
❑ মহানবীর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মূল– মাওলানা ফখর আহমদ চীমা, কাদিয়ান	ঃ অনুবাদ– জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	১৭-২০
❑ কবিতা ঃ শানে মুহাম্মদ (সঃ)	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ (মরহুম)	২০
❑ উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২১-২৩
❑ আদর্শ মানব– হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪-৩০
❑ জুমুআর খুতবাঃ আল্লাহ্আআলার সন্তুষ্টি অর্জন হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা বশীরুর রহমান	৩১-৩৭
❑ মহানবীর মহাজীবনের এক টুকরো	ঃ জনাব শেখ জোনাব আলী	৩৮
❑ ছোটদের পাতাঃ প্রশ্ন-উত্তরের দর্পণে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ– মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম	৩৯-৪০
❑ প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ মদীনা মনোয়ারাস্থ মসজিদুন্নাবী (সঃ)		

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশের এক অংশ আশিস ও কল্যাণমণ্ডিত হয়েছিলো। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বংশের অপর এক ধারা ইসমাঈলের বংশে নবী – বরং এক বিশেষ নবী আসার জন্যে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়েই দোয়া করেছিলেন। (সূরা বাকারা ১৩০ আয়াত)। তাঁদের দোয়া পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইসমাঈলী বংশে আবির্ভাবের মাধ্যমে। হযরত নবী করীম (সঃ) স্বয়ং বলেছেন – আনা দা'ওয়াতু ইব্রাহীম অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল (জামেউস সগীরের বরাতে ইবনে আসাকির)।

আলোচ্য দরূদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, নবী আকরম (সঃ)-এর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানদের মধ্য থেকে একজন মহান নবীর আগমন বাঞ্ছনীয়; নচেৎ লেখকের কথায় মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ওপরে আশিস ও কল্যাণ পূর্ণ হয়নি বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরা কুরআন মজীদ থেকে একদিকে যেমন দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও শরীয়তধারী নবীর আগমনের পথ বন্ধ – ইসলামের বাইরে থেকে তো বটেই ইসলামের অভ্যন্তরেও (সূরা আহযাব: ৪১ আয়াত)। এ আয়াতের প্রতি তাকালে ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় কোন প্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ আশিস ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা সূরা নেসার ৭০ আয়াতের প্রতি তাকাই তখন আমরা আশান্বিত হতে পারি। কেননা, সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তাআলা ও এই মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আনুগত্যের ফলে তাঁর উম্মতের মধ্যে আধ্যাত্মিক কল্যাণের ব্যাপকতা দান করা হয়েছে। সূরা কাওসারে তো তাঁকে (সঃ) বিপুল আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ; অথচ তাঁর শত্রুদের অপুত্রক বলে এ কল্যাণ যে দৈহিক বংশের প্রাপ্য নয় সে দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং সূরা নিসার উল্লেখিত আয়াতে যে চারিটি আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা হলো সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক ও নবী। বিগত ১৪শ বছরে মুহাম্মদী উম্মতের (সত্যিকার আলে মুহাম্মদ) মধ্যে অসংখ্য সালেহ্ বান্দা (ওলী, গাউস কুতুব ইত্যাদি) এবং শহীদ ও সিদ্দীক হয়েছেন এ কথা কারও অস্বীকার করার জো নেই। আর তাঁরা সকলেই যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণে ঐ পুরস্কার লাভ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন বাকী থাকলো কমপক্ষে এমন একজন নবীর আগমনের ব্যাপারটি যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্যে এ পুরস্কার লাভ করবেন তবে তাঁর নতুন কোন শরীয়ত ও মুহাম্মদ (সঃ) থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না। এ ধরনের একজন নবীও সূরা জুমুআর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উম্মতে যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হলেন আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী-এরও দাবী করেছেন। সুতরাং এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, গত প্রায় ১৪শ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহ উম্মতের লোকেরা যে দরূদ শরীফ পড়ে আসছে তা বৃথা যায় নি আর যেতেও পারে না। নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে এ দরূদ তাঁর জন্যে মহাআশিস ও মহাকল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে অন্তত: আর কেউ এ কথা স্বীকার না করলেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করে; নচেৎ সা'দ উল্লাহ্ সাহেবদের প্রশ্নের ব্যাপারে আলোকসম্পাত করা যেত কোন মুখে।

কুরআন মজীদ

উৎকৃষ্টতম আদর্শ মুহাম্মদ (সঃ)

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে" (সূরা আহযাব : ২২ আয়াত)।

ব্যাখ্যা : নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে অন্তহীন পরীক্ষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কঠোর পরীক্ষা ছিল খন্দকের যুদ্ধ। এই কঠোরতম পরীক্ষা হইতে সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁহার নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, তাহার মাহাত্ম্য বা নীচতা, তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয় অথবা যখন সে নিজের শত্রুকে স্বীয় পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিয়া কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এই কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য-প্রমাণে ভরপুর যে, মহানবী (সঃ) স্বীয় সংকট মুহূর্তে যেমন মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমিন মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও হুনায়নের যুদ্ধ তাঁহার সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিকে যেমন ব্যাপকভাবে আলোকসম্পাত করে, তেমনি মক্কা-বিজয় তাঁহার চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোকসম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সংকট ও বিপদ তাঁহাকে হতাশ বা মুহ্যমান করে নাই, আবার কৃতকার্য ও বিজয় তাঁহাকে গর্বিত করে নাই। হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি প্রায় একাকী রণাঙ্গনে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটিয়া যাইবার মত হইল তখনও তিনি নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শত্রুব্যূহে একা প্রবেশ করিলেন, আর তাঁহার পবিত্র মুখে বীরত্বভরে উচ্চারিত হইল–'আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী, আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।' আর যেদিন মক্কা বিজয়ের সাথে, সারা আরব ভূমি তাঁহার পদতলে প্রণত হইল, তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হইলেন না। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিলেন।

মহানবী (সঃ)-এর চরিত্র মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য ইহাই যে, যাহারা তাঁহার নিত্য সাথী ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতেন, তাহারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার দাবীর সাথে সাথে তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন, মহানবী (সঃ)-এর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাঃ), তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁহার চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁহার মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। মহানবী (সঃ) ছিলেন উচ্চতম মানবতার প্রতীক। তিনি (সঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকাইয়া দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনি সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁহার জীবন, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, উন্মুক্ত ইতিহাসের মত পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম (পিতামাতাহীন) বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন, শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি হলেন তাহাদের সকলের কাছে 'আল্ আমীন' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই শপথপূর্বক তাঁহার বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সাক্ষ্য দান করিলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল, বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুদায়িত্বের বোঝা যখন তাহার কাঁধে চাপিল এবং এই কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হইলেন, তখন তিনি মোটেই দমিলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য ও মর্যাদার সহিত তাহা বরণ করিয়া লইলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করিয়াছেন, আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করিয়াছেন। তিনি পরাজয় বরণ করিয়াছেন, বিজয়ীও হইয়াছেন। তিনি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, আবার বিচারকের কাজও করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। "রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং কিছুই তাহার ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, কিন্তু সীজারের রাজদণ্ড তাঁহার ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজস্ব ও রাজ প্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলিবার অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করিয়াছেন, তবে সেই অধিকার একমাত্র মুহম্মদ (সঃ)-এরই রহিয়াছে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল মন্ত্র ও ব্যবস্থা তাঁহার মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করিতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করিতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খাইতেন। সারাদিনব্যাপী নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর, রাত্রির প্রহরগুলি তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটাইয়া দিতেন। এমনকি, দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী দোয়া করিতে করিতে তাঁহার পায়ের পাতা ফুলিয়া যাইত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়া জীবন কাটাইয়াছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নাই" *(মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মাদিজম : বসওয়ার্থ স্মীথ)*।

হাদীস শরীফ

নবী করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

১। হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন, আমি মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআন *(মুসলিম)*।

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন, ছয়টি বিষয়ে আমাকে অপরাপর নবীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে :
(১) সার্বিক তত্ত্বপূর্ণ বাণীসমূহ আমাকে দেওয়া হইয়াছে, (২) প্রতাপ ও প্রভাব শক্তি দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি, (৩) আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, (৪) সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদস্বরূপ ও পবিত্র করা হইয়াছে, (৫) সমগ্র মানবকুলের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি, (৬) আমাকে নবীগণের খাতাম (মোহর) করা হইয়াছে *(মুসলিম)*।

৪। আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট তখন হইতেই খাতামান্নাবীয়ীন ছিলাম যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও কাদা মিশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। *(মুসনাদ আহমদ, কনযুল উম্মাল)*।

৫। হযরত ইবনে আব্বাস (সঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) সমগ্র মানবের মধ্যে সবচাইতে বেশী দানশীল ছিলেন। যখন রমযান মাসে জিব্‌রাঈল কুরআন শরীফ পুনরাবৃত্তির জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। তখন তিনি পূর্বাপেক্ষাও অধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন বরং ইহা বলা চলে যে, তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় মুষলধারা বৃষ্টি ও উহার মধ্যকার প্রবল হাওয়া অপেক্ষাও প্রবলতর ছিলেন *(বুখারী)*।

অনুবাদ ও সংকলন : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

'আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয়নি। সেই 'তওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ব) যা দুনিয়া থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সঃ) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপর উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েযসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মা'রেফতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ট্রেজারী তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। যিন্দা খোদার পরিচয় পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি- তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি' *('হকীকাতুল ওহী'- পৃঃ ১১৫,১১৬)*।

'এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে; অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসূলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি মানবগণের মোহর, নাবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদাতাআলাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কোরআন শরীফ যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইলম ও মা'রেফত বা প্রকৃত জ্ঞান এবং খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতাসমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে বা মাকামে পৌছে যায়' - *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ: ৫৩৫, পাদটীকা)*।

'আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, খোদাতালার সব চাইতে বড় নবী এবং সবচাইতে অধিক ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগণের উম্মতেরা সবাই অন্ধকারে পড়ে আছেন এবং তাদের কাছে বাকি আছে শুধু অতীতের কেচ্ছা-কাহিনী। কিন্তু এই উম্মত হামেশাই খোদাতাআলার কাছ থেকে তাজা-তাজা নিদর্শন পেয়ে থাকে। এ কারণেই এই উম্মতের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক আ'রেফ ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁরা খোদাতাআলার উপরে এরূপ উঁচু স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা যেন খোদাকে দেখতে পান। কিন্তু খোদাতাআলা সম্পর্কে এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস অন্য আর কোনও জাতির ভাগ্যে জুটে ওঠে না। অতএব, আমাদের আত্মা থেকে এই সাক্ষ্য উত্থিত হয় যে, সত্য এবং সঠিক ধর্ম একমাত্র **ইসলাম**। ....

আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শনসমূহ কোন কেচ্ছাকাহিনীর কথা নয়, বরং আমরাও নিজেরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, অনুবর্তিতা করে, অনুরূপ নিদর্শন লাভ করে থাকি। সুতরাং, এ ভাবেই আমরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কল্যাণে হক্কুল ইয়াকীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের স্তরে পর্যন্ত পৌছে যাই। কত না উন্নত সেই পূর্ণ-পারফেক্ট, সেই পবিত্র নবী (সঃ)-এর মর্যাদা ও মহিমা যাঁর নবুওয়ত হামেশাই সত্যান্বেষীর কাছে তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকে। এবং আমরা অনবরত নিদর্শন দেখার কল্যাণে এমন এক উচ্চ স্তরে পৌছে যাই যে, সেখান থেকে আমরা যেন স্বচক্ষে খোদাতাআলাকে দেখতে পাই। অতএব, ধর্ম উহাকেই বলা যায়, এবং সত্য নবী তিনিই হতে পারেন, যাঁর সত্যতার ভরা বসন্ত সর্বদা দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেবল কেচ্ছা-কাহিনী যার মধ্যে হাজার রকমের কমবেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার উপরে নির্ভর করাটা কোন জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীতে শত শত লোককে খোদা বানানো হয়েছে, এবং শত শত পুরান কাহিনীর ভিত্তিতে তাদের মানাও হচ্ছে। কিন্তু আসল কথা তো এটাই যে, সত্য কেরামত (অলৌকিক কার্য) কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাঁর কেরামতের সাগর কখনই শুকিয়ে যায় না। এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। খোদাতাআলা প্রত্যেক যুগে সেই কামেল ও পবিত্র-পুরুষের নিদর্শন দেখাবার জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এবং এই যুগে মসীহ্ মাওউদ নাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখো! আসমান থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং থেকে থেকেই বিভিন্ন প্রকারের অসামান্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে চলেছে। এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি আমার কাছে থেকে নিদর্শনাবলী দেখতে পারে, তা সেই ব্যক্তি খৃষ্টান, ইহুদী, আর আর্যই হোক না কেন। এবং এ সমস্ত কল্যাণ হচ্ছে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের।'

'মুহাম্মদ (সঃ) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ,
মুহাম্মদ (সঃ) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী।
আমি খোদাতাআলার ভয়ে তাঁকে খোদা তো বলতে পারি না,
কিন্তু, খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ।'

(কেতাবুল বারিয়াহ্, পৃঃ ১৫৫-১৫৭, পাদটীকা)।

'আমি দৃঢ় ইয়াকীন ও দাবীর সঙ্গে বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে কামালাতে নবুওয়ত (নবুওয়তের পরিপূর্ণতা) শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঝুটা এবং প্রতারক যে তাঁর (সঃ) খেলাপে বা বিরুদ্ধে এবং বাইরে কোন সিলসিলা কায়েম করে

বা অন্য কোন ধারা স্থাপন করে। এবং তাঁর (সঃ) নবুওয়ত থেকে আলাদা হয়ে কোন সত্যতা উপস্থাপন করে এবং নবুওয়তের ঝরণা-প্রবাহকে পরিত্যাগ করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, তাঁর (সঃ) পরে, অন্য কাউকে স্বতন্ত্র নবী বলে বিশ্বাস করে, এবং তাঁর খতমে নবুওয়তকে ভেঙ্গে ফেলে। এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে জন্য, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এমন কোন নবী আর আসতে পারবে না যার উপরে নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার মোহর থাকবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানেরা এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, তারা খতমে নবুওয়ত ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে এক ইসরাঈলী নবীকে আনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু, আমি বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র-করণ শক্তি এবং তাঁর চিরন্তন নবুওয়তের এ এক সামান্য নিদর্শন যে, তেরশ' বছর পরেও তাঁর (সঃ) শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বা তালীম-তরবীয়তের ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহে মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমন ঘটেছে তারই নবুওয়তের মোহর ধারণ করে। এই আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস যদি কুফরী হয়, তাহলে আমি সেই কুফরীকে প্রিয় মনে করি। কিন্তু, ঐ সকল লোক যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যাদেরকে নবুওয়তের নূর থেকে কোন অংশই দেওয়া হয় নি, তারা বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারে না এবং একেই কুফরী আখ্যা দান করে থাকে। অথচ, এটাই সেই সত্য, যদ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণতা ও চিরজীবি হওয়া প্রমাণিত হয়।' *(আল হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৫ পৃঃ ২)*।

'তাঁর (সঃ) বরকতময় নামগুলির মধ্যে রহস্য এই যে, মুহাম্মদ ও আহ্‌মদ নামের যে দু'টি নাম, তার মধ্যে দু'টি চরম উৎকর্ষতা রয়েছে। 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যে রয়েছে জালাল ও কিব্‌রিয়া অর্থাৎ মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্ব। এই নামের অর্থই হচ্ছে, অতীব উচ্চ স্তরের প্রশংসায় প্রশংসিত। এর মধ্যে এক প্রকার মাশুকানা রঙ বা প্রিয়জন হওয়ার রঙ রয়েছে। কেননা, প্রশংসা তো করা হয়, যে জন মাশুক তারই। অতএব, এর মধ্যে জালালী রঙ বা মহিমা, গৌরব ও প্রতাপের গুণ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু, 'আহ্‌মদ' নামের মধ্যে রয়েছে আশেকানা রঙ বা প্রেমিক বা প্রেমিকার গুণ। কেননা, আশেক-এর কাজ হচ্ছে প্রশংসা করা। যে আপন মাহবুব ও মাশুকের বন্ধু ও দয়িতের প্রশংসা করে থাকে। এজন্যই, মুহাম্মদ নাম যেমন আপন মর্যাদার খাতিরে মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্বের বা জালাল ও কিবরিয়ার প্রত্যাশী, তেমনি, 'আহমদ' নামও আপন আশেকানা মর্যাদার কারণে গরীবি ও নম্রতার আধারস্বরূপ। এর মধ্যে একটা রহস্য এটাই ছিল যে, তাঁর (সঃ) জিন্দেগীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক হচ্ছে তাঁর (সঃ) মক্কার জীবন, যার মেয়াদ কাল ছিল তের বছর, এবং দ্বিতীয় জিন্দেগী হচ্ছে তাঁর মদীনার জীবন যার মেয়াদ কাল দশ বছর। মক্কী জিন্দেগীতে তাঁর (সঃ) আহ্‌মদ নামের গুণাবলীর তাজাল্লী প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি (সঃ) দিন রাত খোদাতাআলার সমীপে আকুলভাবে কান্নাকাটি করেছেন, সাহায্য চেয়েছেন এবং সর্বক্ষণ প্রার্থনার মধ্যে থেকেছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর (সঃ) সেই জীবনের দিনগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তিনি (সঃ) তাঁর মক্কী জীবনে যত আকুল প্রার্থনা ও কান্নাকাটির মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন ততটা কখনোই কোন আশেক বা প্রেমিকা তার প্রিয়তম দয়িতের সন্ধানে করেনি, কেউ করতে পারবেও না। কিন্তু, তাঁর (সঃ) এই আকুল চিত্তের রোনাজারি তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল দুনিয়ার অবস্থা জানার পর তারই জন্য। আল্লাহ্‌র এবাদতের নাম ও নিশানা তখন মুছে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে স্থির আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি ঈমানের কারণে যে আস্বাদ ও আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আস্বাদ ও ভালবাসার সেই আনন্দ দ্বারা তিনি স্বভাবতঃই দুনিয়াবাসীকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, দুনিয়াবাসীর অবস্থা তিনি যখন দেখতেন, তখন তাদের অযোগ্যতা ও তাদের স্বভাবের অবস্থা তাঁকে দারুন মুশ্‌কিলের মধ্যে ফেলতো, মুসীবতের সম্মুখীন করতো। তিনি দুনিয়ার এই অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যেতেন। তিনি এজন্য এতো বেশী কষ্ট পেতেন যে, তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হতো। এদিকেই ইংগিত করে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেনঃ

'সম্ভবতঃ, তুমি তোমার প্রাণকেই বিনাশ করে ফেলবে এইজন্য যে, তারা মু'মিন (বিশ্বাসী) হচ্ছে না' (২৬ঃ৪)।

এ ছিল তাঁর (সঃ) অতি ব্যাকুল প্রার্থনার জীবন, এবং তাঁর 'আহ্‌মদ' নামের প্রকাশ। কিন্তু যে সময় এক অতি মহান আযিমুশশান লক্ষ্যের প্রতি তাঁর চিত্ত নিমগ্ন থাকতো, যার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মদীনার জিন্দেগীতে এবং এ তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের তাজাল্লী প্রকাশিত হওয়ায় সময়ে, তা জানা যায় এই আয়াত থেকেঃ

'এবং তারা বিজয় প্রার্থনা করলো, ফলতঃ, (সত্যের) প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু পরাভূত হলো' (১৪ঃ১৬) */মলফুযাত, ৫২, ৫ পৃ: ১৭৮, ১৭৯*/।

(প্রফেসর শাহ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত 'রসূলে আজম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা' পুস্তক থেকে)

শুভ বিবাহ

গত ১৫ই মে,১৯৯৮ ইং তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আমার কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ সাবিনা ইয়াসমীন (লিপি)-এর সাথে বগুড়া জামাতের সেক্রেটারী তবলীগ জনাব লোকমান হোসেন (পিতা মৃত আব্দুল কাদের, গ্রাম হরিষাদী, পোস্ট রায়কালী, থানা আক্কেল পুর, জেলা জয়পুরহাট)- সাথে ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মহরানায় আহমদীয়া কেন্দ্রীয় মসজিদে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের এলান করেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। এই বিবাহে নব-দম্পতির সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

বশীর আহমদ (বিমান)
নাখালপাড়া।

শুভ বিবাহ

গত ১৬/২/৯৮ ইং তারিখ ডাঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-এলাহী পিতা মরহুম ফকির ইয়াকুব আলী, গ্রাম দুর্গারামপুর, পোঃ বীরগাঁও, জেলা বি-বাড়ীয়ার সহিত আমার দ্বিতীয় মেয়ে মোসাঃ সুলতানা রাজিয়া (পলির) বিবাহ ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মেহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। উক্ত বিবাহ যেন বরকতময় হয় তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সুলতান মিয়া
মাহিগঞ্জ জামাত

কবিতা

না'তে রসূল (সঃ)

"বরতর গুমান ও ওহম ছে আহমদ কি শান হ্যায়
যেছকা গোলাম দেখো মসীহুজ্জামান হ্যায়।"
–এলহাম : হযরত মসীহ মাওউদ–(আঃ)

মোহাম্মদ–যিন্দাবাদ
নূরে খোদা– যিন্দাবাদ
আহ্‌লুহু–যিন্দাবাদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন শাফিয়ে ইয়াওমে দ্দীন
খাতামুন্নাবিয়ীন লে -আউয়ালীন ও আখেরীন
সরওয়ারে কায়েনাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রাহাতে আশেকীন মাশুকে তাহেরীন
আনিসেল গারেবীন শামসিল আরেফীন
ফখ্‌রে মওজুদাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সিরাজুম মুনীরা উস্‌ওয়াতুল হাসানা
তোয়াহা, ইয়াসীন খুলুকিন আযীমিন
লিন্নাসে বাইয়্যেনাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সিরাতে মুস্তাকীম নাজাতে মুযনাবীন
রহ্‌বারে মুত্তাকীন রহমতে আলামীন
লিন্নাসে ফযিলত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

মুজাক্কিয়ে ইনসান খুলুকুহু কুরআন
আয়াতে রহমান আল্লামাহু বায়য়ান
সাহেবে শাফায়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রসূলান শাহেদা কুল্‌-মুলুকে হুম্মেদা
মুজতবা ও মুকতাদা সল্লে 'আলা মোস্তাফা
লিন্নাসে আল্লাদাদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

কামাল শারাফাত হুস্‌ন ও এহ্‌সানাত
খত্‌মে রেসালত জালাল ও জামালাত
খতমে ইনসানিয়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

ওয়ানশাক্কা কামারুন বাশীর ও নাযীরুন
শাহেদুন, গালেবুন আহমাদ ও মাহ্‌মুদুন
সাহেবে দারাযাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রাহ্‌বারে সালেকীন সরওয়ারে সালেহীন
শাহেদীন–সিদ্দীকিন ইমামুন নাবীয়্যিন
মোহরে এনআমাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

কাবাকাওসায়ন ইলাল্লাহে মুতমাঈন
সাহেবে তাদাল্লা মাকামাম্মাহ্‌মুদা
কাওসারে কামালাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সল্লাল্লাহু আলায়কা আলে ও আহলেকা
ও আলা আসহাবেকা ওয়া আলা মসীহিকা
কাওসারে বারাকাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

ফিল উম্মিইনা মিনহুম ও'খারিনা মিনহুম
ইত্তাবেয়ূনি য়ুহ্‌বেবকুম লা-তাসরিবা আলায়কুম
মোকামে ইতায়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সলাতি, নুসুকি মাহ্‌ইয়ায়া মামাতি
লিল্লাহে রব্বি.... মালেকী মাবূদী
কামালে উবূদিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

বাখেউন নাফসাকা মাওয়াদ্দা'কা রব্বুকা
রাফানা লাকা যিকরাকা রামাল্লাহ্‌ ইয রামায়তা
আয়নায়ে উলুহিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

মিনাল্লাহে সুল্লেমা ফী-সিদরাতেল মুন্তাহা
ইলায়কুম জামিয়া ইউহা ইলায়য়া
ফায়েকে বাশারিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সাইয়্যিদনা মোহাম্মদ শাফীয়ীনা মোহাম্মদ
মাওলানা মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুনা মোহাম্মদ
আল্লাহ্‌-নোমা মোহাম্মদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রব্বুন, কারীমুন হাক্কুন, আহাদুন
কাইয়্যুম ও হাঈয়্যুন রউফুন ও রহীমুন
মাযহারে উলুহিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

"ফামা আযামা শানো কামালেহি
আল্লাহুম্মা সল্লে আলায়হে ওয়া আলেহি।"
–হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

– অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

জুমুআর খুতবা

জামাতী নেযামের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ৫ই জুন, ১৯৯৮ইং মসজিদ ফযল, লন্ডন]

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা তাহরীমের ৭ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অতঃপর বলেন, আজকের খুতবায় আমি যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাই উহার বর্ণনা এ আয়াতের শেষাংশে – 'ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউ'মারূন-এর মধ্যে রয়েছে। আমার আজকের খুতবার মূল বিষয়টি এরই মধ্যে নিহিত আছে, যার অনুবাদ বাংলায় এমন হয়, "এবং তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।" 'গেলাযুন শেদাদ–' এর বিষয়টি পৃথক যার মধ্যে আপাতত: আমি যাব না।

আমি আজ কেবলমাত্র ফেরেশ্‌তাগণের গুণাবলী বা স্বভাব নিয়ে আলোচনা করব। তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।

ইসলামে দু'ধরনের পরিভাষা প্রচলিত আছে। একটি মা'মুর – (প্রত্যাদিষ্ট) অপরটি 'উলীল আমর।' (আদেশ দেবার অধিকারী)। মা'মুর তারা হয় যারা সর্বদা ফেরেশ্‌তাদের মতো। যা তাদের আদেশ করা হয় তারা তা-ই করেন। যা তাদের আদেশ করা হয়েছে তার বাইরে গিয়ে তারা কিছুই করতে বা বলতে পারেন না। কিছু ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা কেবল মা'মুর পর্যায়ের হয়ে থাকেন। আর কিছু ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা মা'মুরও হওয়ার কারণে তারা শুধু তাই করেন– যার আদেশ তারা পেয়েছেন – এর মধ্যে কম বেশী করেন না এবং 'উলীল আমর' হওয়ার সুবাদে তারা নিজ বৃত্তের মধ্যে থেকে আদেশও দিতে পারেন। কিন্তু তাদের আদেশ দেবার অধিকার মা'মুরকৃত বা আদেশপ্রাপ্ত আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিজ অঞ্চলে বা নিজ আওতার মধ্যে থেকে তারা আদেশ দেবার অধিকার রাখেন, যখন যেমন প্রয়োজন বোধ হয় তখন তেমন আদেশ তারা নিজ চিন্তা-ভাবনা মতে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে জাগতিক'উলীল আমরদের' অবস্থা – তাদের নিজ অঞ্চলে বা আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নিজ আদেশ জারী করা উচিত। আইনগতভাবে যে পর্যন্ত তাদের সীমারেখা নির্ধারিত আছে এবং যারা তাদের ভোট দিয়েছেন যার ফলে তিনি অধিকার পেয়েছেন তাদের আশানুরূপ তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু প্রায়ই তারা নিজ আদেশপ্রাপ্ত বা মা'মুরীয়তের সীমা রেখাকে ভুলে গিয়ে 'উলীল আমর' হয়ে বসে এবং মানুষের উপর যথেচ্ছা আদেশ দিতে শুরু করে দেয়। এটা হচ্ছে জাগতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা যে 'উলীল আমর' – তা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। যতদিন তারা উলীল আমর থাকবেন ততদিন তাদের আদেশ দেওয়ার অধিকারও থাকবে। এই সমস্ত আলোচনা আমাদের জামাতী নেযাম সংক্রান্ত আলোচনা। মাঝে-মাঝে আমাদের জামাতের কর্ম-কর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন বলে আজ আমি এই বিষয়ে আলোচনা করছি। আমি অনুভব করছি যে, আমাদের নেযামের মধ্যে বা জামাতের ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি যারা – মো'তামাদ,– (মা'মুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) পদে অধিষ্ঠিত আছে তারা কখনও কখনও 'উলীল আমর' বনে বসেন অথচ 'উলীল আমর'– 'আমীর' হবেন। মো'তামাদ উলীল আমর হতে পারেন না। আমীর এক হিসাবে মা'মুরও হন, অথচ আদেশ দেবার ক্ষমতা বা অধিকারও রাখেন।

অনুরূপভাবে জামাতী নেযামের অন্তর্গত সকল পদ– তা জামাতের পদ হোক বা যে কোন অংগ সংগঠনের পদ হোক – সর্বত্র এই দুইটি ধারা প্রচলিত আছে। অঞ্চল ছোট হোক বা বড় হোক – যেমন খোদ্দামুল আহমদীয়া একটি ছোট শাখা – যার মধ্যে ছোট সীমানা বা ক্ষেত্র যা খোদ্দামুল আহমদীয়ার কোন শাখা সেখানেও একজন মো'তামাদ –এর পদ আছে। একজন যয়ীমও হয়ে থাকেন। মো'তামাদ সে যে স্থানেরই হোকনা কেন, কোন বৃত্তের বা কোন অঞ্চলের মো'তামাদ নিজ থেকে আদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে না। সে এমন কান রাখবে (শ্রবণ যন্ত্র) যে 'কান' 'উলীল আমর' -এর আদেশ শুনবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তাকে যা কিছু আদেশ দেওয়া হবে, সে শুধু তা-ই করবে। নিজের পক্ষে থেকে যদি সে কোন আদেশ জারী করে তবে সে মো'তামাদ থাকবে না। মো'তামাদ তো ফেরেশ্‌তার নিকটবর্তী। সে কেন নিজের এই সম্মানজনক পদ পেয়ে খুশী হয় না যে, আমি তো ফেরেশ্‌তা আর আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারাও তো মা'মুর হয়ে থাকেন – 'উলীল আমর' হন না। কুরআন শরীফের কোথাও ফেরেশ্‌তাদিগকে 'উলীল আমর' বলা হয়নি মা'মুর-ই বলা হয়েছে। তারা নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে, সীমারেখার মধ্যে থেকে কেবল ঐসব কাজই করবেন যা করতে বলা হয়। ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হন এবং মানুষের নিকট পৌছে দেন এবং বলেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ আপনাকে পৌছে দিতে এসেছি। এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। ফেরেশ্‌তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা মানুষকে পৌছে দিয়ে থাকেন। নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং স্পষ্ট করে বলে দেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ আপনার নিকট পৌছে দিচ্ছি। হুবহু এই কাজই মো'তামাদের কাজ। যখনই সে কোন ব্যক্তিকে বা মজলিসকে কোন আদেশ দেয় যে, তুমি একাজ কর তখন সে যদি রেফারেন্স না দেয় যে, আমি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আপনাকে বা

আপনাদিগকে এই আদেশ পৌছে দিচ্ছি তবে তার এই আদেশের কানা-কড়িও মূল্য নেই। ঐ জামাত বা ঐ মজলিস এমন আদেশকে অগ্রাহ্য করতে পারে। কারণ সে তো মো'তামাদ, 'উলীল আমর' নয়। যদি সে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ পৌছে দিতে চায় তবে তার উচিত হবে আদেশ প্রদানের সাথে স্পষ্ট করে বলে দেয়া যে, আমি উর্ধ্বতন অমুক কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে এই আদেশ তাঁর পক্ষ থেকে পৌছে দিচ্ছি, আমার পক্ষ থেকে নয়।

এই নেযাম বা ব্যবস্থাপনা সমগ্র কায়েনাত (সৃষ্টির)-এর মধ্যে প্রচলিত নেযাম। আমাদের জামাতকে ইহাকে খুব ভাল করে সকল স্তরে স্মরণ রাখতে হবে যে, **কোন মো'তামাদের জন্য এখানে অপমানবোধ করার মতো কোন স্থান নাই যে, সে মনে করবে, আমার তো মানহানি হয়ে গেছে আমি আদেশ দেবার ক্ষমতা রাখি না।** সমস্ত ফেরেশ্‌তাদের যদি অপমানিত হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয় তবে তো আপনারও অপমান হবার কথা। আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা বড় বিশ্বস্ত মো'তামাদ সত্তার অধিকারী। সুতরাং তোমরা নিজ অবস্থানে সন্তুষ্ট থাক এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। যতবেশী আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহকে স্মরণ করতে পার, ততই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এটা তো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এমন স্থান (পদ) প্রদান করেছেন, যে পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তুমি কোন অনধিকার চর্চা করবে না বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন। এটা এতবড় একটা সম্মান যে, এখানে বসে যদি কেউ মনে করে যে, আমার অসম্মান হয়েছে, তবে তো এটা তার বোকামী। যে ব্যক্তি এই পদ মর্যাদাকে অসম্মানজনক মনে করে সেতো এই পদের যোগ্যতা রাখে না যে, তাকে মো'তামাদ বানানো যেতে পারে।

কুরআন শরীফের এই আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদেরকে পড়ে শোনাব। হযরত আকদস (আঃ)-এর এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই বিষয়টি এমন বিষয় যে, সমগ্র বিশ্বে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বড় আশ্চর্যজনকভাবে বিরাজমান আছে। এই বিষয় সম্পর্কে আমি যখন হযরত আকদস (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর বক্তব্য পড়ে দেখলাম, আমি দেখে আশ্চর্য হলাম যে, হযরত আকদস (আঃ) এই নেযাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেযামকেও আলোচনার মধ্যে শামিল করেছেন। জাগতিক ক্ষমতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে যারা 'উলীল আমর-' তাদেরকেও আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, ধর্মীয় নেযামের মধ্যে যারা 'উলীল আমর' - তাদেরকেও আলোচনার মধ্যে এনেছেন, এমনকি ফেরেশ্‌তাদের নেযামকেও আলোচনায় এনেছেন। কোন দিক বাদ রাখেন নি।

হুযূর (আঃ)-এর লেখা থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি পড়ে এসেছি আর মাত্র দু'তিনটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে পড়ার জন্য নিয়ে এসেছি। (যেগুলো পড়ে এসেছি) সেগুলো এখানে পড়তে হলে আমাকে দীর্ঘ ব্যাখ্যায় যেতে হত। শ্রোতৃবৃন্দ মনে করবেন যে, হযরত আকদস (আঃ) একই কথার পুনারাবৃত্তি করেছেন বার বার। অথচ হযরতের লেখার পুনারাবৃত্তি নেই, আছে বড় জোড়ালো আবেদন। হযরত (আঃ) সাহেব যখনই কোথাও কোন বিষয় পুনরায় বর্ণনা করেছেন যা পূর্বে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, দেখা যাবে যে, প্রত্যেক স্থানে কিছু না কিছু নতুন দিগন্ত অবশ্যই উন্মোচন করেছেন। সেগুলো বুঝতে হলে বেশী চিন্তা করতে হয়। বুঝতে গেলে বেশী সময়ের দরকার হয়। আজ চেষ্টা করেছি যে, অল্প সময়ে যেন বেশী কথা বুঝাতে পারি। হযরত আকদস (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝাতে চাই।

হুযূর (আঃ) বলেছেন, "দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে পূর্বের ঐশী কিতাবে 'ফেরেশ্‌তা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মর্যাদা ফেরেশ্‌তাদের মতই ছিল। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এক হিসাবে ফেরেশ্‌তাদের শ্রেণীভুক্ত। কারণ ফেরেশ্‌তাদের স্বভাব - "ইয়াফ্‌আলুনা মা ইউ'মারূন' অর্থাৎ- 'যা কিছু তাদের আদেশ করা হয় তারা তা-ই করে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গেরও ঐ একই স্বভাব, যা আদেশ দেওয়া হয় তারা তা-ই করে। এমনই মানুষের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ মানুষের আদেশের অপেক্ষমান" (আল্ হাকাম, ৫ম খন্ড নং-৩০, ১৭ই আগষ্ট, ১৯০১ইং)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে অতি সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ফেরেশ্‌তা হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁরা (রাঃ) সকলেই আঁ হযরত (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করতেন। এখান থেকে আলোচনা আরম্ভ করে হযরত (আঃ) মানব দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয় সম্পর্কে তো বড় বড় বিজ্ঞানীরাও আজ কথা বলছেন। আজই আমি একখানা বই পড়ছিলাম। একজন বিজ্ঞানী চেষ্টা করেছেন কিন্তু পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। কারণ কুরআনের গভীর জ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভবপর নয়। সার কথা এই যে, মানবদেহে - মস্তিষ্কের মধ্যে আদেশ প্রদানকারী ক্ষমতা বা সত্তা বিরাজমান আছেন। মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঐ আদেশ পালনে সম্পূর্ণ বাধ্য। কারো অসুস্থতা বা রোগাক্রান্ত হওয়ার অর্থ এই যে, যা আদেশ হয়েছে - তার শরীরের কোন না কোন অঙ্গ তা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যেখানে এই ঘটনা সেখানেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত দেহের নেযাম অচল হয়ে পড়ে যদি ঐ আদেশদাতার আদেশ পালন করা না হয় যে, আদেশ দাতাকে আল্লাহ্ মানুষের মস্তিষ্কে বসিয়ে রেখেছেন। মস্তিষ্কে অবস্থানকারী ঐ আদেশ দাতার আদেশ সমস্ত শরীরে পৌছে দেবার যে ব্যবস্থাপনা তা এত সূক্ষ্ম, এত প্রসারিত যে, যদি বলা হয় যে, মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বার্তা পৌছাতে পথে হাজার হাজার কোটি কোটি 'মাধ্যম' রয়েছে তবে এটা বাড়িয়ে বলা হবে না বরং কমই বলা হবে। আপনারা যতদূর পারেন পড়াশুনা করে, গবেষণা করে দেখুন। আমি যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে পড়ে বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত বিবরণ তো দিয়েছেন যে, একটি অতি সু-শৃঙ্খল নেযাম বা কর্মকান্ড রয়েছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এত সুস্পষ্ট ও সুশৃংখল নেযাম চলছে যে রকম পুরো সৃষ্টিকুলে সারা বিশ্ব চলছে, একটি অনুরূপ নেযাম। এই নেযাম কীভাবে চলছে - এর উত্তর তারা দিতে পারে না। তারা জানে না যে, মস্তিষ্কের মধ্যে যে 'উলীল আমর' বসে আছেন, তার আদেশ দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের, যারা মা'মুর (আদেশ মান্যকারী) হয়ে আছে। ফেরেশ্‌তাদের মত করেই, তারা মস্তিষ্কের আদেশ মানতে বাধ্য। যদি দেহের একটি অঙ্গও আদেশ মানতে ব্যর্থ হয় তবে সমস্ত দেহের পুরা নেযাম ধ্বংস হতে পারে। কোন কোন প্যারালাইসিসের (অবশ) রোগী এমনই দেখা যায় যে, তার কেবল মাত্র ব্রেন সক্রিয় থাকে আর সম্পূর্ণ দেহ পূর্ণভাবে প্যারালাইজড (অবশ) হয়ে পড়েছে। এই সমস্যাটি কি? সমস্যা এই যে, 'আমর-' (ব্রেনের) এর আদেশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে (মা'মুরে) পৌছাতে পারছে না। ফলে দেহ আদেশ পালনে সংবেদনশীল হতে পারছে না তাই সমস্ত নেযাম অচল। কোথাও (যোগাযোগ ব্যবস্থার) সামান্য বিচ্ছেদ ঘটেছে। **এই একই অবস্থা আমাদের জামাতী নেযামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি**

একজন মো'তামাদ, যার নিকট কেন্দ্রীয় আদেশ এসেছে সে যদি কেন্দ্রের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত না করে তবে সমগ্র জামাত প্যারালাইজ্‌ড (অবশ) হয়ে যেতে পারে। অথচ এই দুর্বলতা আমি অনেক জায়গায় দেখেছি। অনেক অনেক বার বুঝানো হয়েছে যে, আপনারা আমীরগণ বা অন্যেরাও - আমার পক্ষ থেকে তো মো'তামাদ। বারা বার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে আপনাদের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই ঐ সকল ব্যক্তিবর্গকে পৌঁছে দিন, যাদের উদ্দেশ্যে ঐ সব বার্তা পাঠানো হয়েছে; কিন্তু দেখা যায় অবহেলা হয়ে গেছে। সুষ্ঠুভাবে ঐ বাণী বা বার্তা তাদের নিকট পৌঁছানো হয় নি, যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে জামাতের অবস্থা এরূপ দৃশ্যমান হয় যেমন (প্যারালাইজড) স্থবির বা অনড় হয়ে আছে।

অতএব, এখানে লক্ষ্য করুন, হযরত আকদস (আঃ)-এর বক্তব্য কত সূক্ষ্ম এবং মিহি। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যদি আমি যেতে চাই তবে এক ঘন্টার খুতবা তো দূরের কথা কয়েক ঘন্টায়ও যথেষ্ট হবে না। বিজ্ঞানের আলোকে এই বিষয়টি যতদূর আমি বুঝেছি এবং জেনেছি তা বর্ণনার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। আমি তো আর সম্পূর্ণটা জানি না – অল্পই জানি। এতটুকুই যদি সূক্ষ্মতার সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করি, বিশেষ করে যদি মনে করি যে, আমার অনেক শ্রোতাবৃন্দ আছে যারা শিক্ষিতও নয়। এমন সকলকে সামনে রেখে বর্ণনা করা যেমন দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রমেরও প্রয়োজন।

এজন্যেই বলেছিলাম যে, অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষেপে হযরত আকদস (আঃ)-এর লেখাসমূহ থেকে জরুরী কথাগুলো বর্ণনা করতে চাই। হযরত (আঃ)-এর প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি যদি বর্ণনা করতে চাই তবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে।

এখন লক্ষ্য করুন এখানে হুযূর (আঃ) যা লিখেছেন, – "দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে পূর্বের ঐশী গ্রন্থে 'ফেরেশ্‌তা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।" আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের দশ হাজার সাহাবীকে কোন কোন কিতাবে 'কুদ্দুসী'ও লেখা হয়েছে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পবিত্র করা হয়েছিল। তাহাদেরকে 'ফেরেশ্‌তা'ও লেখা হয়েছে। **এই ফেরেশ্‌তাদের মত অবস্থা আমি আপনাদের মাঝে দেখতে চাই। এ ছাড়াতো এমন জামাত সৃষ্টিই হতে পারে না। বেশী গভীরে না গিয়েও তো আমি আপনাদের এতটুকু কথা বুঝাতে পারি যে, মানুষের দৈহিক নেযামের অতি সামান্য অংশও যদি (প্যারালাইজড) অচল বা অবশ হয়ে যায় তবে তার সারা জীবনও এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে।** এতটুকু কথা তো আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। সে দেহ এতটা জানতে না-ও পারে যে, কোথায় কোন্ অংশে কি বিঘ্ন ঘটেছে; কিন্তু সামান্য বিঘ্ন ঘটাতেই সমস্ত শরীর অচল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। সে এখন কোন কাজেরই যোগ্যতা রাখে না।

এখান থেকেই অনুমান করুন জামাতের কোথাও সামান্য রোগাক্রান্ত হলেই বাকী সমস্ত জামাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমস্ত রোগেরই – আরোগ্য হওয়া দরকার। হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলার যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ রয়েছে সে সমস্ত আদেশই পালন করা আবশ্যক। কোন আদেশকেই অবহেলা করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে, হুযূর (আঃ) মনে করেছেন যে, সমস্ত জামাতের সকল মানুষ আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ হুবহু পালন করে থাকে। কিন্তু আসল কথা এই যে, পুরোপুরি আমল করতে না পারলেও যদি 'আল্লাহ্-ভীতি' থাকে, যদি সে ভয়ে এমন ভীত হয়ে থাকে যে, 'আমার দুর্বলতার কারণে জামাতের যেন ক্ষতি না হয়।' তাহলে এই ভয়ের কারণে আল্লাহ্‌তাআলা তার দুর্বলতা থেকে জামাতকে নিরাপদ রাখেন। এই ভয়েরই নাম 'তাকওয়া'। এই রোগেরও নিরাময়ের উপায় 'তাকওয়া'। দুর্বলতা অনেক আছে যার মধ্যে আমরা নিমজ্জিত কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জামাতী নেযামের হেফাযতের জন্য প্রত্যেকের অবশ্যই ভীত থাকা উচিত। আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকা উচিত। হে আল্লাহ্! এই দুর্বলতার যে কু-প্রভাব জামাতের নেযামের উপর পড়তে পারে তা যেন না পড়ে। আমাকে রক্ষা কর, আমি যেন শত্রুদের ফেৎনার কারণ না হই।

হযরত ঈসা (আঃ) এ বিষয়ের উপর এভাবে মন্তব্য করেছেন, "যে ব্যক্তির জন্যে অন্য ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তবে তার চেয়ে ভাল ছিল যে, ঐ ব্যক্তির জন্মই না হত।" কারণ সে বড় অপরাধ করেছে। অতএব, নিজ নিজ কর্মের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত যেন অন্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি না করে। ইহা অত্যন্ত জরুরী বিষয় যে, তখনই দুর্বলতা দেখা দেওয়া সম্ভব যখনই আপনি 'উলীল আমর'-এর আদেশকে অবহেলা করবেন বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবেন।

তারপর হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, – **'উলীল আমর' – জাগতিক দিক থেকে হবেন – 'বাদশাহ্'। আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে হবেন 'যুগ-ইমাম'। এই পার্থক্য স্মরণ রাখা দরকার যে জাগতিক দিক থেকে বাদশাহ্ 'উলীল আমর' হয়ে থাকেন, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে 'উলীল আমর' হবেন – 'যুগ ইমাম।' জাগতিক দিক থেকে যে 'বাদশাহ্' আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের বিরোধী নয় তাঁর রাজ্যে আমরা যদি ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকি, তবে তিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত।** (জরুরতুল ইমাম – পৃঃ ২৩)।

অতএব ধর্মীয়ভাবে 'উলীল আমর' কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আর জাগতিক দিক থেকে আমাদের মাথার উপর কোন 'উলীল আমর' নেই এ ধারণা ঠিক নয়। আঁ হযরত (সঃ) যার চেয়ে বেশী কুরআনী জ্ঞান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর কুরআনী মা'রেফত ও কুরআনী গভীর তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে প্রত্যেক বাদশাহ্ বা রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রীয় নেতা বা জাতির নেতাকে 'হাকাম' – (উলীল আমর) তথা 'শাসন ক্ষমতার অধিকারী' বলে গণ্য করা হয়েছে। যার আদেশ মান্য করা দেশের সকলের জন্য আবশ্যক (ফরয)। তিনি 'উলীল আমরের' অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আনুগত্য করা ফরয হবে। তিনি মেধার দিক থেকে যেমনই হোন না কেন বাহ্যতঃ নির্বোধ মনে হলেও, বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে পাগল মনে হলেও, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বড় অত্যাচারীও হন (তবুও)। এই সমস্ত অবস্থার কথা উল্লেখ করে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন কোন অজুহাত খুঁজে না পায় যে, এমন উলীল আমর হলে আমরা কেন আনুগত্য করব? হুযুর (সঃ) বলেছেন, **সকল অবস্থায় 'উলীল আমরের' আনুগত্য করা আবশ্যক। কেবল একটি ক্ষেত্রে মাত্র তাঁর আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে – (আর তা এই যে,) আধ্যাত্মিক বাদশাহ্ (যুগ-ইমাম)-এর আদেশ যদি জাগতিক এই উলীল আমরের আদেশের বিপরীত হয়।** অর্থাৎ একই সময়ে যদি আধ্যাত্মিক বাদশাহ্‌র আদেশ পালন করা জাগতিক বাদশাহ্‌র আদেশের কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে এমন অবস্থায় হযরত রসূলে (সঃ)-এর আদেশ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মতে আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশ এই যে, যুগ ইমাম বা আধ্যাত্মিক উলীল

আমরের আদেশকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জাগতিক উলীল আমরকে সাময়িকভাবে বাদ দিতে হবে।

এই বিষয়টি বার বার বুঝাবার চেষ্টা করেছি। আজ আবারও জামাতী নেযামের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাতে চেষ্টা করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে দেশের আইন আর আহমদীদের বিভিন্ন সমস্যা একটি পৃথক বিষয়। এখানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জামাতের কোন ব্যক্তি হয়ত মনে করতে পারে যে, আমার উপর এখানে যে 'উলীল আমর' তিনি একজন ছোট মাপের 'উলীল আমর'। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আমার প্রধান 'উলীল আমর'– অথবা 'আমাদের স্থানীয় আমীর হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর আদেশকে যেহেতু অগ্রাহ্য করেছে বা অবহেলা করেছে অতএব, আমি আমার স্থানীয় আমীরের আদেশ মানতে বাধ্য নই। কোন ব্যক্তিকে এমন সুযোগ দেওয়া যায় না। যদি এমন সুযোগ দেয়া হয় কাউকে তবে, ফেৎনা-ফ্যাসাদের এমন দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে যে, তা আর কোন দিন বন্ধ হবে না। এখানে এসেই মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। সূক্ষ্ম তফাতটুকু সে বুঝে উঠতে পারে না। এই কারণেই যদিও আমি বার বার বুঝিয়েছি, কিন্তু তারপরও জামাতী নেযাম সুষ্ঠু ও সবল রাখতে এই বিষয়ে বার বার বর্ণনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যদি কোন 'উলীল আমর' –একজন অধীনস্থকে আদেশ দেন যে, – তুমি নামায পরিত্যাগ কর। তখন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দ্বিধায় 'উলীল আমর'–কে বলবেন, "যান আপনি বাসায় গিয়ে বসেন, আমার নামায আমি পড়ব। আপনি 'উলীল আমর' কুরআনের শিক্ষার অধীনে, আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশাবলীর অধীনে এখানে যেসব ফরযসমূহ নির্ধারিত আছে তা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।" হ্যাঁ, ফরযসমূহকে কায়েম রেখে তার চেয়ে যদি ছোট কোন আদেশ হয় তবে তা কখনও কখনও পরিত্যাগ করা সম্ভব হতেও পারে। এই পার্থক্যটুকু বোধগম্য না হওয়ার কারণে সকল সমস্যা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। **ফরযসমূহকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না, একথা স্পষ্ট। এগুলো 'মোহকামাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর কোন ক্ষমতাধর-এর মধ্যে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন না।**

হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনা করাও বৈধ নয় যে, তিনি 'মোহকামাত'কে পরিবর্তন করতে বলবেন। কিন্তু **পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তি যদি 'মোহকামাত' নিজে পালনকারী না-ও হয়, অন্যকে কখনও এমন নির্দেশ প্রদান করতে পারে না।**

এটি বড় আশ্চর্য বিষয় যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজে ফরযকে পরিত্যাগ করে – তবে হযরত আকদস ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মতে এটি তার ব্যক্তিগত পাপ। কিন্তু **যদি অন্যকেও ফরয পরিত্যাগ করতে আদেশ করে তবে এটি মহাপাপ হয়ে যায়। এটা তো তাহলে আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপরে ফয়সালা প্রদান করার মতো ধৃষ্টতা হয়ে যায়।** আপনি যদি কোন আদেশ পালনে অসমর্থ্য হন, যার ফলে আপনার মধ্যে বিনয় ও লজ্জাবোধের ধারণা জন্মে, তবে এটি একটি ব্যক্তিগত পাপ হবে। কিন্তু আপনি যদি দুঃসাহসী হয়ে যান, যে আদেশ দেওয়ার অধিকার আপনার নেই এমন আদেশ জারী করেন তবে মহাপাপ হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'উলীল আমর' সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। এখন আর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যা জামাতী নেযামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন,

'আনুগত্য এমন একটি জিনিস, যদি এটাকে খাঁটি অন্তঃকরণে গ্রহণ করা হয় – তবে অন্তরে এক প্রকারের নূর, রূহে এক প্রকারের তৃপ্তি এবং আলোর সৃষ্টি হয়।" এখানে আলোচ্য বিষয় আনুগত্য। উক্ত বাক্য একজন প্রকৃত আনুগত্যকারী ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। উপরে বর্ণিত শর্তানুসারে **যদি কেউ কোন 'উলীল আমর' বা আমীরের আনুগত্য করে, আর আমীর যদি বাহ্যত: একজন সাধারণ ব্যক্তিও হন তাহলে তার অন্তরে মহত্বের সৃষ্টি হবে, সে প্রশান্তি বোধ করবে। সে জানে যে, যদিও আমি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বড়, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে আমি আমীরের আনুগত্য করছি। এজন্য আমীরের আনুগত্য করছি যে, আমীর আমাকে কেন্দ্রীয়-বার্তা এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী। এই মনোভাব নিয়ে যে আমীরের আনুগত্য করে এটা তার বুযর্গীর প্রমাণ হবে, আল্লাহ্‌র ফযলে সে যে এই পরীক্ষায় পাশ করেছে তা সে অনুভব করতে পারবে।**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, মুজাহেদার (চেষ্টার) ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আছে। অনেকে সারা জীবন মুজাহেদা (চেষ্টা বা সাধনা) করে কাটিয়ে দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, **মুজাহেদার চেয়ে আনুগত্যের বেশী প্রয়োজন। আনুগত্যের ফলে মহাবিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। মুজাহেদার ফলে এক ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে রূহকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে অন্য মানুষের কোন লাভ হবে না।**

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, **মুজাহেদার চেয়ে আনুগত্যের বেশী প্রয়োজন। কিন্তু আনুগত্য যেন নির্মল ও নির্ভেজাল হয়। এমন প্রকৃত আনুগত্য একটি কঠিন কাজ। আনুগত্যের মধ্যে নিজ কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিতে হয়। হৃদয়ের অনেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে কোরবান করতে হয়। ইহা বড় কঠিন কাজ কিন্তু এছাড়া আনুগত্য হয় না।**

অনেক বড় বড় মুজাহেদাকারীর হৃদয়ের অনেক ইচ্ছা তার জন্য প্রতিমাস্বরূপ হয়ে থাকতে পারে। বড় বড় তৌহীদের দাবীদারের অন্তরের অন্ত:স্থলে প্রতিমা রাখা আছে। এই প্রতিমা কী? ইহা মূলতঃ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। **অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে – আল্লাহ্‌র আদেশের উপর প্রাধান্য দেয়া। এটা সরাসরি স্পষ্ট শিরক্।** কিন্তু আনুগত্য করতে না পেরে বিনয়াবনত হয়ে, লজ্জিত হয়ে ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ দেয়া, কান্নাকাটি করা স্পষ্ট শিরক্ নয় বরং মানুষের অন্তরের দুর্বলতা। তবে এই দুর্বলতাকে দূর না করলে ধীরে ধীরে শিরকে পরিণত হতে পারে। অতএব, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বাক্যগুলোকে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। হুযূর (আঃ) বলেছেন, নফ্‌সের কামনা বাসনা এমন এক জিনিস যে, বড় বড় তৌহীদ-বিশ্বাসীদের অন্তরের প্রতিমা হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেখে মনে হয় তৌহীদের ধারক-বাহক, কিন্তু অন্তরে প্রতিমা বসিয়ে রেখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর উপর আল্লাহ্ পাকের কত বড় ফযল ছিল যে, তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। 'নিবেদিত প্রাণ'– অর্থ তারা নিজ অন্তরের সকল আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। আসল কথা হলো কোন 'জাতি' – 'জাতি' হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারে না বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে পারে না – যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আনুগত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

অতএব, **মো'তামাদ হোক বা মো'তামাদকে যিনি আদেশ দেন তিনিই হোন না কেন – উভয়ের জন্য 'আনুগত্য' ফরয করা হয়েছে। আদেশ প্রদানকারী যেন যতদূর তার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আছে তার বাইরে আদেশ না দেয়। কোন সময় যদি**

তাৎক্ষণিক কোন আদেশ নিজ থেকে প্রদান করতেই হয় তবে তা যেন চিন্তা-ভাবনা করে দেওয়া হয়। যতদূর সম্ভব যে নিয়ম প্রচলিত আছে নিজকে তার অধীনে রেখে আদেশ দিবেন। আর মো'তামাদ কোন সময় নিজ থেকে কোন আদেশ প্রদান করতে পারে না। তাকে যে আদেশ দেয়া আছে তার মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ থাকবে। কম-বেশীও সে করতে পারবে না। মো'তামাদ তাই করবে যা করতে তাকে বলা হয়েছে। কমবেশী কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে 'উলীল আমরের' ক্ষেত্রে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হয় 'উলীল আমরের'। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে 'উলীল আমর' যে আদেশ প্রদান করবে এর দায়িত্বভার তাঁরই উপর বর্তাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতেন। কোন সময় যদি জরুরী ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোন ফয়সালা করার দায়িত্ব তাঁদের উপর পড়তো তারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখতেন যে, এমন পরিস্থিতিতে আঁ হযরত (আঃ) কি ধরনের ফয়সালা বা নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর কোন ঘটনা তাদের স্মরণে না আসতো। তখন তাঁর আনুগত্য ও একাত্মতার যে শিক্ষা তাদের পবিত্র হৃদয়ে অনুভব করতেন সেই শিক্ষাই কাজে লাগাতেন। তাঁদের এই একাত্মতা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যা তাঁরা আনুগত্যের কারণে লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁরা যে ফয়সালা করতেন, ঐ ফয়সালা অবশ্যই সঠিক হত। পরবর্তীতে তখন সময়মত আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করতেন যে, এমন সময় এ ফয়সালা করেছিলাম তখন আঁ হযরত (সঃ) বলতেন যে, ফয়সালা ঠিক করা হয়েছে। একথা শুনে সাহাবা মহাখুশী হতেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আনুগত্যের ফলে হৃদয়ে এক ধরনের আলো, নূর বা আনন্দের সৃষ্টি হয়। অতপরঃ বলেছেন, সাহাবাগণ (রাঃ) এমন স্বভাবের ছিলেন যাঁরা আনুগত্যের মধ্য দিয়ে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের (রাঃ) হৃদয়ে কোন আকাঙ্ক্ষা বাকী ছিল না। অতপর, হুযূর (আঃ) বলেছেন – "কোন জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্যের উপর পূর্ণ ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে – ততক্ষণ সে 'জাতি' হিসাবে পরিচিত হতে পারে না।" আর যদি তাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য বা ভেদাভেদ থেকেই যায় - তবে নিশ্চিত যে, এটি অধ:পতনের লক্ষণ। (আল্লাহ্পাক আমাদের জামাতকে অধঃপতনের সমস্ত লক্ষণাদি থেকে দূরে রাখুন) স্মরণ রাখুন – পরস্পরের মত-পার্থক্যের কারণে যদি বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। এক গ্রুপ এক রকম করতে চায়, অন্য গ্রুপ অন্য রকম করতে চায়, এমন অবস্থায় জেনে রাখবেন যে, এটা অধঃপতনের আরম্ভ। এরকম আরম্ভের আর শেষ নাই। 'আসফালা সাফেলীন' – (চরম অধ:পতন– সূরা-ত্বীন)-এর শেষ সীমা। সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোক এরা। আল্লাহ্ বলেছেন, **যারা আনুগত্য হারিয়ে ফেলে তারা সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হয়ে যায়।** এই অবস্থা তাদেরও হয়েছিল যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের কথা মুখে ঘোষণা করেছিল কিন্তু নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের অন্তরের মধ্যে (মূর্তি) প্রতিমা বসাতে আরম্ভ করেছিল। শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তাদের হৃদয়ের অবস্থা কা'বা শরীফের সেই অবস্থার ন্যায় হয়ে গিয়েছিল – যা প্রতিমা দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কা'বা তো তৌহীদের কেন্দ্র থাকার কথা ছিল। এমনই কিছু তৌহীদের দাবীদারও আছে যাদের সম্পর্কে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, –এদের হৃদয় প্রতিমায় পরিপূর্ণ আছে। সুতরাং এ সকল সূক্ষ্ম কথাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কোন প্রতিমাকে কোন অবস্থাতেই আপনার হৃদয়ে স্থান করার সুযোগ দিবেন না। প্রতিমা স্থান পাচ্ছে কি-না এটা বুঝবার উপায় এই যে, জামাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে কি-না। যদি ভেদাভেদ হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে প্রতিমা অবশ্যই প্রতিমা আছে। সেখানে প্রতিমা ভেংগে ফেলার প্রয়োজন আছে। কোন কোন ভাল জামাতের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা এমন প্রতিমার পূজা করেন এবং তাদের নিজস্ব ধারণাকে জামাতের মধ্যে প্রচারিত করে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।

গতকাল আমাকে এক জামাতের জন্য একটা ফয়সালা করতে হলো, যেখানে সমস্ত আহমদীদের মধ্যে কেবল মাত্র চার ব্যক্তি বিভক্তির কারণ ছিল। তারা মনে করত যে, আমরা পুণ্যের কথা বলছি – আমরাই ভাল বুঝি। কিন্তু তারা যা করছিলেন, যেভাবেই তারা পুণ্যের কথা বলছিলেন, ফলাফল তারা জানতেন যে, ফলে মনে মনে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। দলাদলীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিমা পূজার এটি একটি বড় প্রমাণ। যদি দলাদলি হয় তবে বুঝতে হবে ঐ কয়েকজন অবশ্যই দায়ী তারা বাহ্যত তৌহীদের কথা প্রচার করছেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা শিরকের প্রসার ঘটাচ্ছেন।

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, মুসলমানদের অধঃপতনের এবং দুর্বলতার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ ঝগড়া-ফ্যাসাদ। অধঃপতনের আরো কারণ রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, অনেক অনেক কারণ সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে মুসলমানদের অধঃপতন ঘটেছিল কিন্তু অনেক বড় কারণ পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ। সুতরাং যদি মতভেদের কারণগুলোকে পরিহার করেন এবং একজনের আনুগত্য করেন যার আনুগত্য করার নির্দেশ আল্লাহ্তাআলা দিয়েছেন, তবে দেখবেন, যে কর্মসূচীই আপনারা নিবেন তাতেই আপনারা সফল হবেন। **আল্লাহ্র হাত জামাতের উপর থাকে।। এর মধ্যে মূল রহস্য তো এটাই যে, আল্লাহ্ তৌহীদকে ভালবাসেন। জামাতের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না যদি আনুগত্য করা না হয়। জামাতের উপর আল্লাহ্র হাত তখনই হবে যখন সেটা জামাত হবে। আর ততক্ষণ 'জামাত' হতেই পারে না যতক্ষণ একজনের আনুগত্য করা না হয়। যিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট (মা'মুর) হয়েছেন, নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরই আনুগত্য করতে হবে।**

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে সাহাবা কেরাম (রাঃ) বড় বড় মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। "এখানে লক্ষ্য করুন, সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর ফয়সালা করার ক্ষমতাকে কি সুন্দরভাবে বড় শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এমন নয় যে, সাহাবা কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে সম্পূর্ণরূপে এজন্যে মাথা নত করতেন যে, তারা বুদ্ধিমান ছিলেন না– বোকা ছিলেন। অথবা তাঁদের (রাঃ) নিজস্ব কোন মতামতই ছিল না (এমন নয়)। হযরত (আঃ) বলেছেন তাঁরা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের স্বভাব এরূপ বানিয়েছিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক কলাকৌশল সম্পর্কে বেশ পারদর্শী ছিলেন। কারণ যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে আবূ বকর (রাঃ) এবং তারপর উমর (রাঃ) খলীফা হয়েছিলেন তাদের হাতে রাজত্ব এসেছিল, তখন তাঁরা রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখান থেকেই অনুমান করা যায় যে, তারা কি ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ)-কে দেখুন! আঁ হযরত (সঃ)-এর সামনে মনে হত, যেন তাঁর নিজস্ব কোন মতামতই নেই। আবার কোন সময়

নিজের মতামতকে আঁ হযরত (সঃ)-এর মতামতের সামনে এমনি পরিত্যাগ করেছেন, যেন তিনি কোন মতামত দেবার যোগ্যই নন। কিন্তু আনুগত্যের রূহ ছিল। কিন্তু যখন মতামত বা রায় দেবার সময় আসল, তিনি একজন সুযোগ্য মতামতদাতা হিসাবে পরিগণিত হলেন। তিনি খলীফা হয়ে রাজ্য শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। আজকের বুদ্ধিজীবীরাও লিখেছেন, হযরত উমর (রাঃ) একটিও রাজনৈতিক ভুল করেন নি। সারা জীবন রাজ্য পরিচালনা করে গেছেন। যদি আজকে শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যায় আর ধর্মীয় দিকে দৃষ্টি দেওয়াতো ভিন্ন বিষয়। বর্তমানের বিখ্যাত পর্যবেক্ষকগণ লিখেছেন যে, আমরা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনকাল এবং কার্যপ্রণালীর যতই নিখুঁতভাবে বিচার করি না কেন, এটা প্রমাণিত সত্য যে, তিনি সারা জীবনে একটিও রাজনৈতিক ভুল করেন নি। তিনি একজন মহান রাজনীতিবিদ ছিলেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, 'এমন কথা মনে করিও না যে, তাঁরা উপযুক্ত মতামত দেবার যোগ্যতা রাখতেন না।' তোমরা নিজেদেরকে সুযোগ্য রায় বা মতামত দেবার অধিকারী মনে কর। কোন কোন সময়ে নেযামের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে কথা বল। তোমরা কি জান যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সুযোগ্য মতামতদাতা ছিলেন। কিন্তু 'উলীল আমরের'– সামনে মাথা নত করে থাকতেন। পুনরায় আল্লাহ্‌তাআলা যখন রায় প্রদান করার অনুমতি দিলেন, তখন তাদের রায় ও দক্ষতা কেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। কিন্তু অনুমতি পাওয়ার পূর্বে নয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে তাঁদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, হুযূর (সঃ) যা কিছু ইরশাদ করেছেন, সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ হুযূর (সঃ)-এর বক্তব্যের সামনে নিজেদের মতামত বা রায়কে তুচ্ছ মনে করে তা ত্যাগ করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) যা কিছু ইরশাদ করেছেন তারই উপর আমল করাকে জরুরী বলে মনে করেছেন। **সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর আনুগত্য এই পর্যায়ের ছিল যে, তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। 'আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে বিলুপ্তকরণ' – কি সুন্দর বাক্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ব্যক্ত করেছেন!** সাহাবা (রাঃ) এমনভাবে বিলীন হয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সকল আমল থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করতেন। তাঁদের মনে হত এটাও আনুগত্য। আনুগত্যের এই বিষয়টি এভাবে হযরত আকদস মাহদী (আঃ) তুলে ধরেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে যে ধরনের আচরণ করেছেন– সেটা পূর্ণ আনুগত্যের কারণে ঘটেছিল। এমন আনুগত্য যে, তাঁরা (রাঃ) জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যৎসামান্য আমলেরও যদি অনুসরণ করে তবে তা বিফলে যাবে না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, 'তাঁরা (রাঃ) আনুগত্যের মধ্যে এভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর ওযুর পানির মধ্যেও বরকত (কল্যাণ) অন্বেষণ করতেন।' হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পূর্বে আর অন্য কেউ এই বিষয়টিকে 'আনুগত্যের' সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। বড় বড় বক্তারা বক্তৃতায় বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারের প্রেম ছিল? এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন যে, সাহাবা (রাঃ) রসূল (সঃ)-এর ওযুর পানি থেকে বরকত অন্বেষণ করতেন। যদি তাঁদের মধ্যে এ ধরনের আনুগত্যের অনুপ্রেরণা বোধ না থাকত বা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দিতেন আর এভাবে যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ বিদ্যমান থাকতো তবে তাঁরা এতবড় মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন না।

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, "আমার মতে শিয়া-সুন্নীদের মধ্যেকার মতবিরোধের মীমাংসার জন্য এই একটি যুক্তিই যথেষ্ট।" সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মধ্যে পরস্পর মত-বিরোধে বা বৈরীভাব মোটেই ছিল না। কারণ তাঁদের সাফল্য ও অগ্রগতি থেকে ইহাই প্রমাণিত হয়েছে। এই একটি যুক্তিই যথেষ্ট – কীভাবে, তা তো ইমাম মাহাদী (আঃ)-এর ভাষায় না বুঝলে বুঝতে পারবেন না। শিয়ারা বলেছে যে, সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য বিরাজ করছিল। হযরত আলী (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে মতবিরোধ ছিল। হযরত মাহদী (আঃ) বলেছেন, যদি মতবিরোধ থাকতো তবে কোন অগ্রগতিই হতো না। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে এবং তার পরবর্তী কালে **খোলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে, বিরাট বিরাট বিজয় ও সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল – এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে ভেদাভেদের দাবী – মিথ্যা দাবী। মতবিরোধ থাকলে অগ্রগতির আশা করা যায় না।** দেখুন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কত শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, "আমার মতে এই একটি যুক্তিই – শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসার জন্য যথেষ্ট।"

আসলেই এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট। যারা কিছু বিবেক-বুদ্ধি রাখেন বা চিন্তা করেন তাদের জন্য। সাধারণ মানুষ যারা যুক্তি-প্রমাণ বুঝবার ক্ষমতা রাখে না তাদের জন্যে বড় বড় যুক্তি-প্রমাণও যথেষ্ট হয় না। সাধারণ মানুষ তো সাধারণ-ই তাদের ওলামায়ে কেরামগণও এই যুক্তি বুঝতে পারে নি। আর দলীল-প্রমাণ এর ভিত্তিতে মান্য করা তাদের নিজেদের আমিত্বের বিপরীত। যারা নিজেদের অন্তরে অসংখ্য আমিত্বের প্রতিমা সাজিয়ে রেখেছেন যে, তাদের দ্বারা এটা কি করে সম্ভব হবে যে, যুক্তি-দলীল-প্রমাণ দেখে নিজের এই আমিত্বের বিপরীত অন্য কারো কথা অবনত মস্তকে মেনে নেবেন?

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন যে, 'অবুঝ বিরুদ্ধবাদীরা বলেছেন যে, তলোয়ারের জোরে ইসলামের বিস্তার ঘটানো হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি একথা ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা এই ঘটেছিল যে, হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আনুগত্যের বারিধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উপ্‌ছে পড়ছিল।' – দেখুন কত চমৎকার ও নতুন দলিল! আমরা যে দলিল জানতাম, তা ভিন্ন ছিল। হুযূর (আঃ)-এর মতে আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের বারিধারা হৃদয়ের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ভরে উপছে পড়েছিল – এমন পানির বন্যাকে পৃথিবীর কোন শক্তিই আটক করতে পারে না। এই যুক্তি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) দিয়েছেন। এটা অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা যে, এমন প্রবল বন্যার পরিবর্তে কোন তরবারী কাজে আসতে পারে? ঐ আনুগত্য ও ঐক্যের ফলে তাঁরা (রাঃ) অন্য মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ যেখানে এ ধরনের উপ্‌ছে পড়া বন্যার ফলে হৃদয় জয় করা হচ্ছিল, সেখানে তরবারীর বা কিসের প্রয়োজন ছিল? তরবারীর প্রসঙ্গইতো এটা ছিল না।

হুযূর (আঃ) বলেছেন – "আমার তো ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, রসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) যে তরবারী ধারণ করতে হয়েছিল তা কেবলমাত্র নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নতুবা যদি তাঁরা তরবারী ধারণ না-ও করতেন, তবুও তাঁরা শুধু পবিত্র বাণী প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব জয় করতেন। এমন পবিত্র বাণী যা হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয় তা নিঃসন্দেহ হৃদয়ে স্থান দখল করে নেয়।" **অর্থাৎ অন্তরের কথা অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেই।**

হযরত (আঃ) বলেছেন, "তাঁরা একটি সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন, খাঁটি অন্তঃকরণের মাধ্যমে। এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা বানাওট

ছিল না। তাদের সততা ও একনিষ্ঠতাই তাঁদের সাফল্যের সোপান হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, যিনি সত্যের পরাকাষ্ঠা তিনি সত্যের তরবারিই ব্যবহার করেন। তাঁর জন্য সত্যের তরবারি ছাড়া অন্য কোন তরবারির প্রয়োজন হয় না। আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র চেহারার উপর তাওয়াক্‌কুল আলাল্লাহ্‌র (আল্লাহ্-ভরসা) নূর দেদীপ্যমান ছিল।

আমরা যাকে আল্লাহ্‌র নূর বলছি আসলে তা কী? ওটা তো তাওয়াক্‌কুল আলাল্লাহ্‌র (আল্লাহ্-ভরসা) নূর। যিনি কথা বলার সময় জানতেন যে, পেছনে আল্লাহ্‌তাআলার সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নূর যিনি প্রাপ্ত হন, তিনিও পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র তাওয়াক্‌কুল বা আল্লাহ্-ভরসার নূরও পেয়ে থাকেন। সুতরাং যারা বলে যে, 'রসূল (সঃ) নূর ছিলেন' – তারা জানেন না যে, 'নূর কি জিনিস।' বাহ্যিক নূর তো পৃথিবীর সুদর্শন চেহারাগুলোর উপর দৃশ্যমান হওয়া উচিত বা দেখা যাওয়া উচিত। কিন্তু ওখানে যা দেখা যেতে পারে, তাতে তো কোনই হাকীকাত (প্রকৃত নূর) নেই। অতএব, বাহ্যিক বা দৈহিক নূর এবং ঐ আধ্যাত্মিক নূর যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর এর মধ্যে তফাৎটা কি? এই তফাৎ যদি বুঝতে চান তবে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত রসূল (সঃ)-এর পবিত্র চেহারা দেখুন। এই যে বাক্য – "আঁ হযরত (সঃ)-এর চেহারায় 'তাওয়াক্‌কুল আলাল্লাহ্'-র নূরের আবরণ ছিল।" এই বাক্য পাঠ করে কোন সামান্য বিবেকবান ব্যক্তিও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলতে পারবে না। কোন বড় মুর্খ হতে পারে, হয়ত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না এমন ব্যক্তি হতে পারে, হুযূর (আঃ)-এর কোন বড় শত্রু হতে পারে, যার উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে, এমন ব্যক্তি হয়ত হুযূর (আঃ)-এর বাক্য পাঠ করেও তাঁর সত্যতা বুঝতে পারে না। অথচ যে ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদাকে না দেখেছে, সে অমন বাক্য বলতে পারে না।

তারপর হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন,

"আঁ হযরত (সঃ)-এর মোবারক চেহারার উপর 'তাওয়াক্‌কুল আলাল্লাহ্'র নূরের আবরণ ছিল, এমন আবরণ যার মধ্যে জালালী (প্রতাপ বা বিক্রম)-এর জামালী (স্নিগ্ধ মনোরম সৌন্দর্য) রংসমূহ বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে এমন আকর্ষণ ছিল যার ফলে মানুষের অন্তর অনায়াসে আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। তারপর আঁ হযরত (সঃ)-এর এই জামাত আনুগত্যের এমন অপূর্ব নমুনা দেখিয়েছিলেন, এর এই নমুনার উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যা অলৌকিক ও মো'জেযাস্বরূপ ছিল। যে কেউ সাহাবায়ে কেরামের এই নমুনা দেখত সে নির্দ্বিধায় এর মধ্যে চলে আসত।"

আজ আমাদের জামাতের মধ্যে এমন নমুনার প্রয়োজন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পয়গাম তো বই-পত্রের মাধ্যমে অন্যদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে কিন্তু যে পয়গাম আপনাদের (আদর্শ বা নমুনার) মাধ্যমে পৌঁছবে তার চেয়ে শক্তিশালী পয়গাম অন্য কোনভাবে দেয়া যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মত আকর্ষণ যখন আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে তখন মানুষ যারা দেখবে তারা আকৃষ্ট হয়ে আপনাদের মধ্যে চলে আসবে। ইহা এমন এক মো'জেযা হবে যা বড় অসাধারণ হবে। সাধারণ পীর ফকীররা যে সব 'কেরামাত' দেখায় তার চেয়ে সেটা অনেক বড় মো'জেযা হবে।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মত অবস্থা এবং ঐক্যের প্রয়োজন আজও রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা এই জামাতকে, যে জামাত হযরত মসীহে মাওউদের (আঃ) হাতে প্রস্তুত হচ্ছে – এই জামাতকে সাহাবায়ে কেরামের ঐ জামাতের সাথে শামিল বা গণ্য করেছেন, যে জামাত আঁ হযরত (সঃ)-এর হাতে প্রস্তুত হয়েছিল। জামাতের অগ্রগতি এমনই মানুষের নমুনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই তোমরা যারা নিজেদেরকে হযরত মাহদী (আঃ)-এর জামাত বলে পরিচিত হয়ে সাহাবায়ে কেরামের জামাতের শামিলে করার আকাঙ্ক্ষা করছ, তোমরা নিজেদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের রং সৃষ্টি কর।'

আনুগত্য যদি থাকে তবে অগ্রগতি, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব যদি থাকে তবে এমনই হোক যেন সকল দিক থেকে তোমরা সাহাবায়ে কেরামের রং এ রঙ্গীন হও।

(আল্ হাকাম, ৫ম খন্ড, ফেব্রুয়ারী– ১৯০১ইং)

হযরত ইমাম মাহাদী (আঃ) নিজ কিতাব আয়নায়ে কামালাতে ইসলামে লিখেছেন:

"যে ব্যক্তি সামান্য কিছু মা'রেফত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) রাখে, সে জানে যে, প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কর্মরত আছে। পানির প্রত্যেকটি বিন্দু যা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তা-ও আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া আমাদের শরীরে ভাল বা মন্দ কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম – পৃঃ ৮৬-৮৭ টীকা)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এই বাণী চিকিৎসা জগতের একটি বড় রহস্য। চিকিৎসা জগতের সমস্ত ডাক্তার তারা যে কোন প্রকারের চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে জড়িত থাকুন না কেন, এই অটল সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। পানির এক বিন্দুও শরীরে কোন ক্রিয়া করতে পারে না, যতক্ষণ না এমন এক অনুকুল অবস্থা বিরাজমান থাকে। শরীরে অনুকুল অবস্থা যদি না হয় যদ্বারা পানিকে শোষণ করে কাজে লাগাতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন পিপাসুকে প্রচুর পানি পান করিয়ে দিলেও তার কোন লাভ হবে না। তারা এরূপ ঐশী আদেশকে বুঝেন না, কিন্তু এই রহস্যকে তারা দেখেছেন। অনেক সময় শরীর এক বিন্দু পানিও গ্রহণ করতে পারে না। হযরত ইমামুয্‌যামান (আঃ) বলছে , ঐশী নির্দেশের ফলে এমন হয়। আমরা যেমন বলে থাকি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না।

প্রকৃত সত্য এটাই যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে চলছে। তুমিও যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন হয়ে যাও, তবে এমন এক বিন্দু পানির মত হতে পার যা পৃথিবীর যে কোন সুস্থ নেযামের মধ্যে বা সুস্থ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে অনুকুল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে। আল্লাহ্ যদি তোমাদের মধ্যে 'প্রভাবশালী' বা 'ক্রিয়াশীল' – হওয়ার যোগ্যতা দান করেন তবে, তুমি 'প্রভাবশালী' বা 'ক্রিয়াশীল' হতে পার। তখন পৃথিবীর কোন শরীর তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

আমি হযরত আকদসের (আঃ) এই উদ্ধৃতি থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। আশা করি আল্লাহ্‌র ফযলে জামাত এই কথা শুনে – এ সব সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে বুঝতে পারবে এবং পৃথিবীতে একটি বিরাট বিপ্লব সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জন করবে, যে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ আমাদের জামাতের গোড়াপত্তন করেছেন।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ: মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
সদর মুরব্বী

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক তবলীগের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ

আল্লাহ্তাআলা হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে একটি আদেশ দিয়েছেন, বলেছেন ঃ *"ইয়া আয়্যুহার রসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলায়কা মির রব্বিকা"*–হে রসূল ! তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি মানুষের কাছে পৌছে দাও। *"ওয়া ইল্লাম তাফ্য়াল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহ্"*–যদি তুমি তা না কর–এই বাণী না পৌছাও, তাহলে প্রতীয়মান হবে, তুমি যেন এই রিসালতের হক্–তোমার উপর ন্যস্ত এর দায়িত্বই পালন করলে না। *"ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান্ নাস"*–মানুষের কবল থেকে আল্লাহ্তাআলাই তোমাকে রক্ষা করবেন। এ পথে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর বিরোধিতা অনিবার্য। তবু, যাঁর আদেশের তুমি অনুবর্তিতা করবে, সে আল্লাহ্ই তোমাকে হিফাযত করবেন।

আজ বিশেষভাবে ঐ সব দেশ আমার দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে যারা পিছিয়ে আছে। কেননা, তবলীগের কাজে তারা অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ লোকই তবলীগের দিকে যথাযথ মনোযোগ দেয়নি এবং তারা এটাকে এক বাড়তি কাজ বলে মনে করে। ইহা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বাজে ও বেহুদা ধারণা। ওরূপ ধারণার অপনোদনের উদ্দেশ্যেই আজ আমি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি। তবলীগ আদৌ বাড়তি কাজ নয়। যদি এটা বাড়তি কাজ হতো, তাহলে আল্লাহ্তাআলা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলতেন না যে, 'তুমি তবলীগ করো। নচেৎ তুমি রিসালতের দায়িত্ব পালনকারী বলে গণ্যই হতে পার না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি কি এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি একাই তবলীগ করবেন এবং মান্যকারীদের জন্য অনুমতি থাকবে, তারা যা-ইচ্ছা করে বেড়াবে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্কে একা তবলীগ করার জন্য ছেড়ে দেবে ? এটা তো তেমনই লাঞ্ছনাজনক কথা যেমন মূসার জাতি মূসাকে বলেছিল, "যাও, তুমি এবং তোমার প্রভু উভয়ে যুদ্ধ করতে চলে যাও, আমরা তো এখানেই বসে থাকবো। তোমরা জয়ী হতে পারলে আমাদের জানিও।" আল্লাহ্তাআলা ইচ্ছা করলে তাঁকে বিজয় দিতেও পারতেন, কিন্তু দেননি। আর সেজন্য মূসাকেও অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

যদি আঁ হযরত (সঃ), যাঁর জন্য আল্লাহ্ নিখিল বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁকে তিনি সম্বোধন করে বলছেন, "যদি তুমি তবলীগ না কর, তাহলে তুমি আমার দৃষ্টিতে তোমার উপর অর্পিত রিসালতের হক ও দায়িত্ব পালনকারী বলেই গণ্য হবে না। কাজেই, হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর গোলামগণ ! যদি তোমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন না কর, তাহলে তোমাদের কী হাল-অবস্থা বা মূল্য হবে, তা তোমরা ভেবে দেখো। যদি তোমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পয়গাম উত্তরোত্তর মানুষের কাছে না পৌছাও তাহলে তোমরা কাদের মধ্যে গণ্য হবে ?

অনেকে বলে থাকেন, 'ভালো কথা ! তবলীগ তো করা হচ্ছে- জামাত করছে। আমাদেরও তাতে অংশ আছে বলে ধরে নিন।' ওসব ব্যক্তির প্রতি আমার জবাব এই যে, আলবৎ তাতে আপনাদের অংশ নেই। আর্থিক কুরবানী ভিন্ন জিনিস। ইবাদতগুলো করা ভিন্ন জিনিস। তবলীগকে স্পষ্টতঃ সম্মুখে রেখে আল্লাহ্ এর আদেশ এজন্যই দিয়েছেন যে, অন্যান্য সব বিষয় ব্যতীত, ইহা স্বতন্ত্র একটি বিষয়। সেই মহান ব্যক্তিকে এর আদেশ দেয়া হচ্ছে, যিনি মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। এরূপ ব্যক্তিকে আদেশ দেয়া হচ্ছে যিনি কায়িক ইবাদতসমূহের দিক দিয়ে সবাইকে অতিক্রম করে গেছেন, যিনি ইবাদতকে অনতিক্রমণীয় মার্গে পৌছে দিয়েছেন; যে সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। "বাল্লিগ মা উনযিলা ইলায়কা মির্রব্বিকা"–এহেন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, 'তুমি যদি তবলীগ না কর, তাহলে তোমাকে রিসালতের হক পালনে ব্যর্থ বলে ধরা হবে।'

অতএব, **সর্বপ্রথম মন-মস্তিষ্ক থেকে এই কীটবৎ ধারণাটি বের করে দিন যে, সাধারণভাবে জামাত যেহেতু তবলীগী কর্মকাণ্ড সাধন করে যাচ্ছে, তা-ই যথেষ্ট। বস্তুতঃ প্রত্যেকের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি কোনও না কোন আকারে তবলীগে অংশ গ্রহণ করা।**

পরিশ্রান্ত হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরাপুরি কার্যকরী নেযাম সচল-সক্রিয় হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেক নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে তবলীগে অংশ গ্রহণকারী হিসেবে নেযামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে শামিল হওয়ার জন্য প্রত্যেকের যোগ্যতা স্বতন্ত্র (ভিন্ন ভিন্ন) হয়ে থাকে। এরূপ অংশগ্রহণকারীও থাকেন, যারা শয্যাশায়ী অবস্থায় কেবল দোয়াই করে থাকেন। ওরূপ কিন্তু যারা করেন তাদের সম্পর্কে কে বলতে পারে যে, তারা শামিল নয় ? এর চে' বেশি সামর্থ্য নেই তাদের। যারা এর চে' অধিক তওফীক ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অংশ গ্রহণ করছেন না বা কম অংশ গ্রহণ করছেন তাদেরকে নেযামের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। অতএব, জামাতের বিভিন্ন অংশের ও ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য নির্ণয়ের ভিত্তিতে জরীপকরণ এবং যাদের যোগ্যতা বা সামর্থ্য কম, তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থাগ্রহণ–এটা নেযামে–জামাতের কর্তব্য।

এখনতো বছর শেষ হতে দু'মাসেরও কম সময় রয়েছে। শতাব্দী ফুরাতেই বা আর কত সময় অবশিষ্ট আছে ? এই সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী সকলের কাছে আমাদেরকে আমাদের উদ্যোগে পয়গাম পৌছাতে হবে যাতে আমরা বলতে পারি, "হে আগামী শতাব্দী এবং তারও পরবর্তী শতাব্দী ! আমাদের প্রেমাতিশয্য এবং আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা তোমাদেরকেও অংশ দান করেছে, অতএব তোমরাও আমাদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রেখো।" এ সেই পয়গাম, যা আজকের আহমদীয়তের জগতকে আগামীকালের আহ্মদীয়তের জগতের কাছে পরিবাহিত করতে হবে। সেজন্যেই সাহসিকতার সাথে বুক বেঁধে নিন। বিগত দিনের শৈথিল্য ঝেরে ফেলুন।

সর্বপ্রথম, এরূপ নেযাম কায়েম করা, যার মাধ্যমে প্রত্যক ব্যক্তির সাথে সেভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা, যেভাবে ছিল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাথে আল্লাহ্তাআলার। আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে আদেশ দেয়া হচ্ছিল, "বাল্লিগ মা উন্যিলা ইলায়কা মির্রব্বিকা"–তোমার প্রভুর তরফ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তুমি মানুষের কাছে পৌছে দাও। এই মহান পয়গামের সমীকরণ সম্পর্কেই এখনও আপনাদের অধিকাংশের জানা নেই যে, এর কী মাহাত্ম্য। আল্লাহ্ ছিলেন প্রেরক, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ প্রাপক, যিনি একাই আদেশানুযায়ী পয়গাম পৌছে দিলেন। আল্লাহ্ও তাঁকে আদেশ দানে সঠিক পদক্ষেপ নিলেন। কেননা, তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার মানে সকলকে নির্দেশ দেওয়া এবং সমগ্র জগতময় তাঁর পয়গামকে পৌছে দেওয়া। কেননা, তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের রসূল। আরও এই যে বলা হলো, "ওয়া

ইল্লাম তাফ্আল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু"–যদি তবলীগ না কর, তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম সম্যক পৌছালে না। কাজেই এর দ্বারা সমগ্র জগতময় তবলীগ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়ে গেলো আঁ হযরত (সাঃ)-এর উসীলায়। অতএব, এখন আপনাদের দ্বারা গৃহে গৃহে পয়গাম ওভাবেই পৌছে যাওয়া উচিত। অধিকাংশ মানুষই অবহিত নয়। নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ নবীনই জানে না যে, আল্লাহ্‌র উক্ত পয়গাম আগেই পৌছে আছে, কিন্তু তা তাদের কাছে পৌছে নি। এরপর আমাদের অর্থাৎ তাঁর গোলামদের কর্তব্য ছিল, ঘরে-ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ওভাবেই তা পৌছে দেওয়া। আমরা সেভাবে এখনও পৌছাই নি।

একা একজনের পক্ষে এ বিশাল নেযাম কোথাও কায়েম করা কখনও সম্ভব নয়। **কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী তবলীগকে যদি এই খুতবা সারাটাও শুনিয়ে দেন, দেখবেন, তবু তিনি এসে কিছুই করে উঠতে পারবেন না। কেননা, এ কাজ করবার মত তার সামর্থ্য নেই। এ সামর্থ্যের প্রেক্ষিতেই আমি একাজ সমাধার জন্য গোটা মজলিসে আমেলার দায়িত্ব ও কর্তব্যস্বরূপ নির্ধারণ করছি। মজলিসে আমেলার সার্বিক সামর্থ্য ও ক্ষমতা এ কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হওয়া উচিত।** বরং সমষ্টিগত দায়িত্ব হবে সমগ্র মজলিসে আমেলার। এ সব বিষয়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে প্রত্যেক দেশের মজলিসে আমেলার উপর। এবং আমীর হচ্ছেন উহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়স্বরূপ। একজন আমীরের কর্তব্য, এসব বিষয়কে যেন কার্যকর ও সচল করতে শুরু করেন। আল্লাহ্‌র উপর তওয়াক্কুল (ভরসা) রাখুন। তারপর, ক্রমাগতভাবে লক্ষ্য রাখুন, ক্রমে ক্রমে কিন্তু সুনিশ্চিৎ ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে এ কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই জরীপ-ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে, পৃথক পৃথকভাবে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, লাজনা, আর আনসারুল্লাহ্ এই ভাগগুলো আমি হতে দেবো না। এভাবে কাজ এলোমেলো ও বিকৃত হয়ে যায়। কিছু আনসারুল্লাহ্‌র পাল্লায় পড়ে যায়, কিছু খোদ্দামের, আর কিছু আতফালের। তারা নিজস্ব ধারায় ভুল-ভ্রান্তিও করতে থাকে। অনেক সময় বিষয়গুলোকে হাল্কা করে ফেলে। আমীরের পদমর্যাদাতে আলাদা একটা ভারিক্কি ও গাম্ভীর্য রয়েছে, যা উপ-সংগঠনসমূহের অধিকারভুক্ত নয়। সেজন্য আমীরদেরই দায়িত্ব নির্ধারণ করছি। মজলিসে আমেলা নিয়ে বসুন এবং ইচ্ছা করলে খোদ্দাম বা আনসার থেকে লোক নিন। আর এই নির্দেশনা ছিল যে, "আনসারুল্লাহ্‌র সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে এবং খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আমীরের কিছুও করণীয় নেই" যেহেতু তাদেরকে পৃথক পৃথক করতে চাচ্ছি না, **যদি আমীর কোন অঙ্গ-সংগঠনের সদরকে বলেন যে, তার এই ধরনের লোকের প্রয়োজন, তাহলে সেই সদরের কতর্ব্য হবে ঐ ধরনের ব্যক্তিদের বেছে সংগ্রহ করে দেয়া।**

অতএব, **যখনই আমীর আপনাদেরকে ডাকেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিন। যতোজন লোক তিনি চান, ততোজন আপনারা তাঁর সমীপে পেশ করে দিন।** এই বলে যে, আপনাদের ওমুক ওমুক হালকায় ওমুক ওমুক ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা তাঁর এই এই কাজের উপযুক্ত।

আমীর প্রয়োজনীয় মানুষ চাইবেন সমগ্র দেশের জরীপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, যাতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন তিনি জানাবেন, এর জন্য এই ধরনের মানুষ দরকার। তারপর আমীর তাদের উপর পরিচালক নিযুক্ত করে বলবেন, ১০/১৫ দিনের মধ্যে সারা দেশে খোঁজ নিতে হবে যে, কারা কারা তবলীগ করছেন এবং কীরূপে করছেন।

ওগুলোর মধ্যে আরেকটি উপায় হচ্ছে যে, জানতে হবে, তাদের মধ্যে সবচে' সফল ও প্রভাবশালী দায়ী ইলাল্লাহ্ কে বা কারা।

কিছু কিছু লোক অবশ্যই আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা কতক বিশেষ গুণ দান করেছেন, যেমন কথার মিষ্টতা, সরলতা, এমনি ধরনের আরও কিছু বিশেষত্ব, যা অবশ্য-অবশ্যই ফলোদয়ের কারণ হয়। কাজেই ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষই এক ধরনের হয়ে থাকে এবং ফলবিহীন বৃক্ষই ভিন্ন ধরনের। কিন্তু ঐ বৃক্ষগুলোকেও ফলোৎপাদনের উপযোগী করে তোলাও তো আমাদের কাজ। সেজন্য ফলোৎপাদক বৃক্ষস্বরূপ যারা, তাদেরকে জিজ্ঞেস তো করুন যে, তারা তবলীগের ক্ষেত্রে কী করেন। এই মানববৎ বৃক্ষগুলো তো জিজ্ঞাসা করলে বলে দেন, তারা কী উপায় অবলম্বন করে থাকেন। যদ্দরুন আল্লাহ্‌র ফযলে ফল ধরছে।

তবলীগিচ্ছুক মানুষদের হাত ধরে ধরে তাদেরকে তবলীগের ক্ষেত্রে নামাতে হয়। ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তবলীগের রীতিনীতি ও পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা আপনারা প্রণয়ন করুন, চিন্তা-ভাবনা করুন। তারপর তাদেরকে বুঝিয়ে শিখিয়ে ব্যবস্থাপনার অধীনে এ কাজ তাদের মধ্যে ভাগ করুন।

সারা বিশ্ব-জগতের প্রাকৃতিক নেযাম বা ব্যবস্থাপনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, যে বিষয়গুলো তবলীগ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি তা এগিয়ে নিয়ে চলুন। তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমাদের তবলীগের নেযাম উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হতে থাকবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরও কথা আছে, যা বুঝাতে হবে। আপাততঃ আমি আপনাদেরকে দু'টি কথা অবহিত করেছি। উল্লেখিত নেযামটি জারী করুন। তা করতে গিয়ে হয়তো সারা বছর ব্যাপী পরিশ্রম করেও তা পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠবে না। আগামী দু'মাস তো খুবই কম সময়। কিন্তু একটি কথা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি যে, একজন আহ্‌মদীকেও যদি আপনারা মানুষের জন্য কল্যাণজনক ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, একজনকে তো তার সৃষ্টির রীতিনীতি ও আদব-কায়দা শিখিয়ে দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যখন কেউ এ কাজ শিখে যায়, তখন তাতে সে এতো স্বাদ উপভোগ করে যে, অবলীলায় সে নিজেই এ কাজটিকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। বরং তার চিন্তা-ভাবনা ও অনুপ্রেরণা জেগে উঠে, যাতে সে ঐ কাজটি আরও সঠিক মাত্রায় করতে পারে। ওরূপ ব্যক্তিদের জন্য তো কোন সেক্রেটারী তবলীগের আর প্রয়োজন থাকে না। এরাই হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে আমি বলছি যে, সেক্রেটারী তবলীগ ও নেযামে জামাত যেন ফায়দা গ্রহণ করে। অতএব, যখন আপনারা সমগ্র জামাতকে নেযামের ছাঁচে ঢেলে দেখেন, তখন জামাত সম্মুখে নিজে-নিজে এগিয়ে যাবে। তখন আপনাদেরকে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল দোয়া ব্যতীত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এ বিষয়গুলো পালন করার তওফীক দান করুন। যাতে আমরা আমাদের কাজগুলোকে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হই এবং প্রত্যেক আমীর যেন অনুধাবন করেন যে, আজকের দিনটি তার বিগত দিনের চে' উত্তম এবং এই দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আগের চেয়ে অধিকতর শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে সম্পাদনের সামর্থ্য রাখেন।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-কর্তৃক ৬ই জুন, ১৯৯৭ প্রদত্ত খুতবা থেকে চয়নকৃত)

উপরোক্ত খুতবার আলোকে
খোদ্দাম, আনসার ও লাজনার দায়ীয়ানে
ইলাল্লাহ্‌র তালিকা তৈরী করে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন
এবং এ মুহূর্ত থেকে জামাতের নেতৃত্বে তবলীগের
কাজে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করুন।
–সেক্রেটারী তবলীগ

হযরত রসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের অভিমত

(১)

"এই পৃথিবীতে যদি কোন মানুষ খোদাতাআলাকে পেয়ে থাকেন, যদি কোন মানুষ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে খোদাতাআলার ইবাদতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে থাকেন, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আরবের নবী (সঃ)-ই সেই ব্যক্তি।

"মনুষ্য জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, মুহাম্মদ (সঃ) তার মধ্যে শুধু মহোত্তমই নন সাধুতমও বটে।"

(এ, জি, লিওনার্দ : 'ইসলাম–হার মরাল এ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু')

(২)

"এটা বলা ভুল যে, তরবারি দিয়েই ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনই তরবারির ব্যবহার হয়নি। তরবারি দিয়েই যদি ধর্ম প্রচার করা যায়, তবে কেউ উদ্যোগী হয়ে আজকের দিনে তা দেখায়ে দিলেই তো পারেন।" *(অধ্যাপক রামদেব : সম্পাদক, বৈদিক ম্যাগাজিন)*

(৩)

"ইসলামের নবী (সঃ) শুধুমাত্র ব্যক্তি যিনি ধনী ও নির্ধনের মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করেছিলেন এবং মানবজাতিকে সত্যিকারের সাম্যের শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের জীবনের সর্বস্তরেরই পথ-প্রদর্শনকারী। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজার চেয়েও বড় ছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ।"

(এইচ, জে, রোস্তমজী, বার এ্যাট-ল)

(৪)

"ইসলামের নবী (সঃ) ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভকারী নেতা। আল্ কুরআন যীশু খৃষ্টের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, সুতরাং একজন খৃষ্টান হিসাবে আমি ইসলামের নবীকে সম্মান দেখাতে বাধ্য। খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল যখন এই পবিত্র পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পবিত্র মসজিদের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলিম খলীফাগণের আমলে খৃষ্টান গীর্জাগুলি পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। এই পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত এদেশেও অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।" *(দেওয়ান বাহাদুর এস, পি, সিংহ : পাঞ্জাবের খৃষ্টান নেতা)*

(৫)

"মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সভ্যতার এবং বিশ্বস্ততার একজন আদর্শ পুরুষ। বিশ্বস্ত তাঁর কর্মে, তাঁর কথায় এবং কাজে।"

(টমাস কার্লাইল)

(৬)

"এই মহাগুরু (সঃ)-এর চরিত্র মানবতার একটি মহামূল্য সম্পদ।

(ডঃ হরদয়াল, এম, এ, পি-এইচ ডি)

(৭)

মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু সেই দাবীই করে গেছেন, যা তিনি প্রথম করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন সবচেয়ে গভীর দর্শন এবং সবচেয়ে সত্য খৃষ্টান ধর্মও এই দাবীকে–তাঁর নবী হওয়ার–খোদাতাআলার একজন সত্য নবী হওয়ার দাবীকে মেনে নিতে সম্মত হবে!" *(বসওয়ার্থ স্মীথ)*

(৮)

"আমি তাঁকে, এই আশ্চর্য মানুষটিকে [মুহাম্মদ (সঃ)-কে] গভীরভাবে জেনেছি; এবং আমার মতে তাঁর খৃষ্ট-বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মত কোন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের এক-নায়কত্ব গ্রহণ করেন, তবে তিনি এর সমস্যাবলী ঠিক সেইভাবেই সমাধান করতে পারবেন, যার ফলে পৃথিবীর বুকে চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইউরোপ মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মমতের প্রতি রীতিমত অনুরক্ত হয়ে উঠেছে এবং একথা বলা যায় যে, ইউরোপের ইসলামীকরণ শুরু হয়ে গেছে।" *(জর্জ বার্ণাড শ')*

(৯)

"আগ্রহশীলতা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। আগ্রহশীলতার এই মহোত্তম অর্থেই তিনি [মুহাম্মদ (সঃ)] ছিলেন একজন আগ্রহী পুরুষ এবং এই আগ্রহশীলতাই সেই বস্তু যা জীবিতকালে মানুষকে দুষিত হওয়া থেকে, পচন থেকে রক্ষা করে।" *(স্টেনলি লেন পুল)*

(১০)

"রাষ্ট্রের অধিপতি, সেই সঙ্গে চার্চেরও অধিপতি হওয়ায় তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সীজার এবং পোপ; কিন্তু পোপের ভড়ং ব্যতিরেকেই তিনি ছিলেন পোপ এবং সীজারের সৈন্যবাহিনী ব্যতিরেকেই সীজার। কোন স্থায়ী দেহরক্ষী ছাড়াই, কোন রাজ প্রাসাদ ছাড়াই, কোন নির্ধারিত খাজনা ছাড়াই, যদি কোন মানুষ কখনও এই কথা বলিবার অধিকার রাখেন যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তবে তিনি মুহাম্মদ (সঃ)"। *(বসওয়ার্থ স্মীথ)*

সংগ্রহ : **অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

স্থানীয় আমীরদের অনুমোদন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নিম্নোক্ত জামাতগুলোর আমীরগণের নির্বাচনে সদয় অনুমোদন দান করেছেন। সকলের অবগতি, দোয়া ও সহযোগিতার জন্যে এলান করা যাচ্ছে ঃ

জামাতের নাম	আমীর
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত	জনাব খোন্দকার সাঈদ আহমদ
চট্টগ্রাম জামাত	জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান
ঢাকা জামাত	জনাব আফযাল আহমদ খাদেম
নারায়ণগঞ্জ জামাত	জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

মহানবী (সঃ)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

যখন আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীতে তাঁহার রসূল ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে প্রেরণ করেন তখন সর্বদা তাঁহার সহিত হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের আচরণ করা হইয়া থাকে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে। একজন সাহাবী রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেন যে, পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী কষ্ট কাহার ওপর আসে? তিনি বলেন, রসূলগণের ওপরে। ইতিহাসও এই সকল ঘটনায় পূর্ণ যে, খোদার পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা দুর্বিসহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কখনো ধৈর্যের আঁচল নিজেদের হাতছাড়া করেন নি। পরিশেষে ঐ ধৈর্য সর্বদা দুশমনদের যুলুমের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে। দুঃখ-কষ্ট যে পরিমাণে বেশি হয় সেই পরিমাণে ধৈর্যশীলগণের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বাড়িয়া যায়। যেহেতু হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবীঈন ও সৈয়্যদুল মুরসালীন অর্থাৎ তাঁহার পদমর্যাদা সকল নবীর চাইতে উচ্চ ছিল, এইজন্য তাঁহার ওপর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদও সে তুলনায় বেশী আসিয়াছিল। ইহাতে তিনি ও তাঁহার জামাতও ধৈর্যের ঐ নমুনা দেখাইয়াছেন, যাহার দৃষ্টান্ত না তো বিগত যুগে দেখিতে পাওয়া যায় এবং না ভবিষ্যতে এইরূপ সম্ভব।

ধৈর্য একটি মহান চারিত্রিক গুণ এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর মর্যাদা এই চারিত্রিক গুণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত খোদা স্বয়ং বলিয়াছেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার পদযুগল উত্তম চারিত্রিক গুণের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত। আমরা যদি তাঁহার শৈশবের অবস্থা চিন্তা করি তবে দেখিতে পাই যে, শৈশব হইতেই দুঃখ-কষ্টের যুগ শুরু হইয়া যায়। কোন কোন সময় দেখিতে পাওয়া যায় শৈশবের দুঃখ-কষ্ট মানুষের মধ্যে জিদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেয়। বড় বড় লোকেরাও এইরূপ খিটখিটে মেজাযের হইয়া থাকে, যাহাদের শৈশব দুঃখ-কষ্টের পরিবেশে কাটিয়াছে। অথবা কোন কোন শিশু এমতাবস্থায় এইরূপ হীনমন্যতার শিকার হয় যে, তাহারা সারা জীবন উহা সামলাইতে পারে না। কিন্তু আমরা উৎসর্গীকৃত এই প্রিয় প্রভুর জন্য, যাঁহার শৈশব চরম হতাশাজনক অবস্থায় কাটিয়াছে। যে কোন শিশুর ধ্বংসের জন্যও এরূপ অবস্থা যথেষ্ট। কিন্তু এই কষ্টের অবস্থা তাঁহার মধ্যে না-তো হীনমন্যতা সৃষ্টি করিতে পারিল এবং না তাঁহাকে জেদি ও বিদ্বেষপরায়ণ বানাইতে পারিল। সর্বপ্রথম বেদনা তাঁহার জন্যও ইহাই ছিল যে, তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়া গেল এবং অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তিনি পৈতৃক স্নেহ হইতে বঞ্চিত রহিলেন। যখন মা'র সহিত তাঁহার স্নেহ-বন্ধন গড়িয়া উঠিল তখন জন্মভূমির বাইরে এক জায়গায় যাইয়া তাঁহার মা-ও দশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়া গেলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাথ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি দাদার তত্ত্বাবধানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দশ বৎসর পর তাঁহাকে এই স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইল। তখন তিনি তাঁহার চাচার আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে এক এক করিয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে তাঁহার সকল আপনজন তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। কিন্তু এই অবস্থার বিপরীতে তাঁহার মধ্যে এইরূপ চারিত্রিক গুণের জন্ম হইল, যাহা সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থায় জন্ম নেয় না।

তাঁহার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল। যখন তিনি চাচার গৃহে লালিত-পালিত হইতেছিলেন তখন তাহার সেবিকা বর্ণনা করে যে, সকল শিশু খুব হৈ চৈ করিত, কিন্তু তিনি নীরব থাকিতেন সকল শিশু খাবার তাড়াহুড়া করিয়া নেওয়ার জন্য বায়না করিত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য খাটানোর চেষ্টা করিত। কিন্তু তিনি নীরবে তাঁহার পালা আসিলে খাবার নিতেন।

আপনজনদের মৃত্যু প্রাকৃতিক দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে, যাহা এক সাধারণ মানুষের ওপরও আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহাকে জগদ্বাসীর হেদায়াতকারী হওয়ার দরুণ দুঃখ-কষ্টের এক দীর্ঘ যুগ পাড়ি দেওয়া বাকী ছিল।

বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাকে নবুওয়তের পোষাক পরাইলেন এবং বলিলেন, "হে রসূল! যাহা কিছু তোমার ওপর অবতীর্ণ করা হইতেছে তাহা সুষ্ঠুভাবে লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তবে তুমি পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করিলে না।" সেদিন তাঁহার জন্য কষ্টের এইরূপ একটি যুগ নিয়া আসিল যাহা শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষী হইয়া রহিল। কখনো তাঁহাকে পাগল বলা হইত। কখনো তাঁহাকে কবি বলা হইত। কখনো তাঁহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইত। তাঁহার সাহাবীগণের প্রতিও অশ্লীল গালি-গালাজ ও কুৎসা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কেবল নিজেই ধৈর্য ধরিতেন না বরং সাহাবাগণকেও ধৈর্য ধারণেরই উপদেশ দিতেন। মক্কার কাফেরদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারটিতো দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার মহল্লাবাসী ও প্রতিবেশীরা সযত্নে তাঁহার পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। নামায পড়ার সময় হৈ চৈ করিত। তাঁহার পথে নোংরা আবর্জনা ফেলিয়া রাখা হইত। এই সকল ক্ষেত্রে তিনি চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক স্ত্রীলোকের দৈনন্দিন কাজ ছিল সে বিনা ব্যতিক্রমে নিজের ঘরের ময়লা-আবর্জনা তাঁহার ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া মারিত। কিন্তু একদিন যখন তাহার ঘর হইতে আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হইল না তখন তিনি তাহার ঘরে গেলেন ও তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দিন সে অসুস্থ ছিল এবং এই কারণেই সে আবর্জনা ফেলিতে পারে নাই। যখন তিনি তাহাকে রোগ শয্যায় দেখিতে গেলেন তখন সে তাহার দৈনন্দিন এই কাজের জন্য এতখানি অনুতপ্ত হইল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিল।

কাফেররা সর্বদা তাঁহাকে নামায আদায় করা হইতে বিরত রাখিতে চাহিত এবং নামায পড়ার সময় কখনো কখনো তাঁহার উপর আক্রমণ করা হইত। একবার তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় আবূ জাহল নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তাঁহাকে নামায পড়িতে দেখিল। তখন সে তাঁহাকে জঘন্য গালিগালাজ করিল এবং মারপিটও করিল। কিন্তু তিনি সংযমের নমুনা দেখাইলেন এবং নীরব থাকিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হামযার দাসী এই ঘটনা দেখিতেছিল। যখন হামযা শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন সে তাঁহাকে খোঁটা দিয়া কহিল, আজ আবু জাহল তোমার ভাতিজাকে খুবই গালি-গালাজ করিয়াছে। ইহাতে হামযা তৎক্ষণাৎ আবূ জাহলের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, তুমি তাঁহাকে গালি-গালাজ কর, কেননা সে নীরব থাকে। শুন, আজ হইতে আমিও তাঁহার সাথে আছি।

মোট কথা, ঐ গালি যাহা একজন দাসীও সহ্য করিতে পারিল না, সমাজে যাহার কোন ইজ্জত থাকে না, হযরত রসূলে আকরম (সঃ) পূর্ণ ধৈর্য ও সংযমের সহিত তাহা সহ্য করিলেন।

যখন মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধাচরণ ও তাহাদের দেওয়া দুঃখ-কষ্ট খুব বাড়িয়া গেল তখন তিনি মক্কা হইতে দূরবর্তী তায়েফে তাঁহার পয়গাম পৌঁছাইতে মনস্থ করিলেন। তায়েফ মক্কা মোয়াযযমা হইতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা কৃষি পণ্যের দরুন স্বচ্ছল এলাকা ছিল। তিনি যায়েদ বিন হারেসকে সঙ্গে লইয়া তায়েফ গেলেন। তিনি তাহাদিগকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহারা গাল-মন্দ দিয়া তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল। তাহারা ইহাতে ক্ষান্ত হইলেও বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এই দুষ্টরা আমাদের প্রিয় প্রভুর পিছনে বাউণ্ডলে ছেলেদিগকে লাগাইয়া দিল। তাহারা পৃথিবীর সবচাইতে মহান মানুষকে হাসি-বিদ্রূপ ও নিন্দা করিতে থাকিল। এমনকি তাঁহার পবিত্র রক্ত তায়েফের গলিতে ঝরিতে লাগিল। তাহারা তায়েফ হইতে তিন মাইল দূর পর্যন্ত এইভাবে সমানে তাঁহার উপর পাথর বর্ষণ করিতে করিতে চলিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। একবার হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহুতাআলা আন্হা তাঁহাকে জিজাসা করিয়াছিলেন যে, হুযূর, আপনার জীবনের সবচাইতে অধিক কষ্টদায়ক দিন কোন্‌টি ছিল? তখন তিনি এই দিনের কথাই বলিলেন। একবার তিনি সাহাবাগণের মধ্যে বসিয়াও ইহার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, একজন পয়গম্বরকে তাহার জাতি এত মারিল যে, তাহাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল। তিনি তাহার শরীর হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা কর। ইহারা জানে না"।

বস্তুতঃ তিনি তায়েফ হইতে বাহির হইয়া একটি বাগানে আসিয়া আশ্রয় নিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা আসিল এবং বলিল, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি তায়েফ নগরীকে এই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে পিষিয়া ফেলিব। কিন্তু তিনি বলেন, না, না এইরূপ করিও না। কেননা, এই লোকেরা জানে না যে, তাহারা কি করিতেছে।

এই ঘটনা না কেবল তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উপর আলোকপাত করে বরং উহার সহিত তাঁহার ক্ষমা ও দয়াও সম্পৃক্ত। তিনি যে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন তাহা বিফলে যায় নাই। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর তায়েফের একজন সর্দার আসিয়া তাহার জাতির পক্ষ হইতে বয়াত করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইল।

মক্কার কাফেরদের দেওয়া দুঃখ-কষ্ট তাঁহার নিজের সহিত সম্পৃক্ত ছিল এবং সাহাবাদিগকে যে কষ্ট দেওয়া হইত তাহাও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের উপরই গিয়া পড়িত। সাহাবাদের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সাহাবাগণকে ধৈর্যের উপদেশ দিতেন। একবার তিনি বাজার হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, কতিপয় লোক আম্মার (রাঃ)-এর পরিবারকে ভয়ানক কষ্ট দিতেছে। তিনি তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে আম্মার! ধৈর্য ধর। হে আম্মারের মা! ধৈর্য ধর।

কাফেররা তাঁহাকে সঠিকভাবে ইবাদতও করিতে দিত না। তাঁহার ইবাদতে সবধরনের বাধা সৃষ্টির জন্য তাহারা চেষ্টা করিত। একবার তিনি নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় এক দুষ্কৃতকারী আসিল এবং পিছন হইতে তাহার ঘাড়ে কাপড় পেঁচাইয়া এত জোরে টানিল যে, তাঁহার চক্ষু বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) আসিয়া পড়িলেন এবং তিনি আসিয়া তাঁহাকে ছাড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই ব্যক্তিকে কেবল এইজন্য মারিতেছ যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ্‌তাআলা। ইহাতে এই কাফের আবূ বকর (রাঃ)-কে এত মারিল যে, তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন এবং লোকেরা তাঁহাকে উঠাইয়া ঘরে আনিল। ইহা কেবল একটি ঘটনা নহে; বরং বিরুদ্ধবাদীরা পরবর্তীতে নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছিল। তিনি জীবন্ত ধৈর্যের নমুনা হইয়া তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছিলেন। একবার এই সকল দুষ্কৃতকারী একটি নূতন দুষ্টামি উদ্ভাবন করিল। মক্কার কাফেররা খানা কাবায় বসিয়াছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামায পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিল, অমুক জায়গায় উট যবাই করা হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যে সেখানে যাইয়া উটের নাড়ীভূঁড়ি উঠাইয়া আনিয়া মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর রাখিয়া দিবে (নাউযুবিল্লাহ)। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্য হইতে এক দুষ্কৃতকারী গেল এবং সত্য সত্যই সে উটের নাড়ীভূঁড়ি উঠাইয়া আনিল এবং তাঁহার পবিত্র মাথার উপর রাখিয়া দিল। তখন আমাদের প্রিয় প্রভু সেজদার অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হযরত ফাতিমা আসিলেন। তিনি ইহা দেখিলেন এবং নাড়ীভূঁড়িটিকে মাথা হইতে সরাইয়া দিলেন। তখন তিনি তাঁহার মাথা উঠাইলেন।

এই সকল ঘটনা তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উচ্চমার্গকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে। পৃথিবীতে কাহাকেও এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই এবং হইতে পারে না যে, কাহাকেও এত কষ্ট দেওয়া হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁহার শত্রুদিগকে "আজিকার দিনে কোন কৈফিয়ত নাই" এর "শাস্তি" শুনাইলেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার উপর আরো একটি কষ্টদায়ক যুগ ঐ সময়েও আসিল যখন তাহারা অন্যায় বয়কটের কর্মসূচী তৈয়ার করিয়া খানা কাবায় লটকাইয়া দিল এবং সমগ্র মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদিগকে, যাহাদিগকে তাহারা সাবী বলিত, সম্পূর্ণরূপে সামাজিক বয়কট করিল এবং মুসলমানদের জন্য পৃথিবী বিস্তৃত হওয়ার পরিবর্তে সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

তারা চুক্তি করিল যে, বনু হাশেম বংশকে বয়কট করিয়া দেওয়া হইবে। এই চুক্তিটি 'মুকাতেয়া' নামে খ্যাত। চুক্তি অনুযায়ী মক্কার কোন ব্যক্তি তাহাদের সহিত কোন প্রকারের কোন সম্পর্ক রাখিবে না এবং না তাহাদের সহিত কোন ক্রয়-বিক্রয় করিবে। যাহা হউক মুসলমানরা আবূ তালেবের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইল। যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে এই যুগ মুসলমানদের জন্য চরম কষ্টদায়ক ছিল এবং সবচাইতে বেশী কষ্টদায়ক ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর জন্য যিনি তাঁহার নাজুক স্বভাব ছাড়াও এই কষ্টের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিলেন। মোটকথা, এই যুগটি হযরত রসূল আকরাম (সঃ) চূড়ান্ত ধৈর্য ও উচ্চমার্গের সাহসিকতার সাথে অতিক্রম করেন। এই যুগে মুসলমানদের খাদ্য ছিল কোন কোন সময় শুক্‌না পাতা। তাহারা চামড়া সিদ্ধ করিয়া আগুনে গরম করিয়া খাইতেন। একজন সাহাবী বলেন, একদিন আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হইয়া বাহিরে গেলাম পায়ের নীচে কিছু একটা নরম জিনিস পড়িল। অন্ধকারের মধ্যে আমি ইহা না দেখিয়া গিলিয়া ফেলিলাম। আমি আজ পর্যন্ত জানি না উহা কি বস্তু ছিল। যাহা হউক এই অবস্থা তিন বৎসর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। অতঃপর মুসলমানরা তাহাদের ঘরে যাওয়ার অনুমতি পাইল। এই যুগের বিস্তারিত অবস্থা পড়িলে মানুষের লোম শিহরিয়া ওঠে।

অতএব হাজার হাজার দরূদ এই মহান হিতৈষীর উপর এবং হাজার হাজার দরূদ তাহার জামাতের ওপর যাহারা পরিপূর্ণ ধৈর্যের নমুনা দেখাইয়াছে। আমরা কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের এহসানের কৃতজ্ঞ থাকিব। কেননা, ইহা তাহাদের কুরবানীর ফল যে, আজ আমরা ইসলামের ন্যায় মহান নেয়ামত হইতে আশিস লাভ করিতেছি।

তিন বৎসর পর এই বয়কটতো শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রসূল আকরাম (সঃ)-এর জন্য এই বয়কট তাঁহার দুই প্রিয় স্বজন হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হইল। একজন হইলেন হযরত খাদীজা, যিনি ছিলেন তাঁহার সকল দুঃখ-সুখের বন্ধু। দ্বিতীয়জন হইলেন পিতার স্থলাভিষিক্ত চাচা আবূ তালেব। তাঁহাদের মৃত্যুর বেদনা তাঁহার জন্য খুব বড় ছিল। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ইহা বরদাশ্‌ত করিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কষ্ট এবং কাফেরদের কষ্ট দেওয়া আরো বাড়িয়া গেল।

একবার তিনি বাজার হইতে আসিতেছিলেন। এমন সময় এক স্ত্রীলোক ঘর হইতে ছাই আনিয়া তাঁহার মাথায় নিক্ষেপ করিল। তিনি নীরবে ঘরে চলিয়া আসিলেন। হযরত ফাতেমা তাঁহার মাথা হইতে ছাই ধুইতে ধুইতে কাঁদিতে থাকিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, ফাতেমা! চুপ হইয়া যাও। খোদা তোমার পিতাকে ধ্বংস করিবেন না।

অবশেষে মক্কার কাফেররা যখন দেখিল যে, এতসব কিছুও তাঁহার দৃঢ়পদকে স্খলিত করিতে পারিল না তখন তাহারা এই নবুওয়তের জ্যোতিকে তাহাদের মুখের ফুৎকারে চিরকালের জন্য নিভাইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু খোদাতাআলা তো এই জ্যোতিঃ দ্বারা সারা বিশ্বকে উজ্জ্বল করিতে চাহিতেছিলেন। এই জন্য তিনি মক্কা হইতে নেহায়েত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় হিজরত করিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁহার কথা তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তিনি বলেন, "হে মক্কা! তুমি আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়। কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকিতে দেয় নাই।"

মোটকথা, মদীনায় হিজরতের পর যদিও মুসলমানরা পূর্বের তুলনায় অনেক শান্তির মধ্যে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার ধরন পরিবর্তিত হইয়া গেল। এখন দুঃখ-কষ্ট অন্য রঙে প্রকাশিত হইতে লাগিল। হিজরতের দুই বৎসর পর তাঁহাকে বদরের যুদ্ধ লড়িতে হইল। মক্কার কাফেররা মদীনাতেও মুসলমানদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিল না। তাহাদের উপর বলপূর্বক পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইল। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের বড় নেতা মারা গেল। ইহা তাহাদিগকে আরো ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিল।

ওহুদের যুদ্ধের দিনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্য খুব ভয়ানক সময় গিয়াছিল। কাফেররা তাঁহার পবিত্র শরীরকে ঘায়েল করিল। তাঁহার দুইটি দাঁত শহীদ হইয়া গেল। ইহা ছাড়া দুইটি পেরেক তাঁহার পবিত্র শরীরে গভীরভাবে বিঁধিয়া গেল। পরে অনেক কষ্টে পেরেক দুইটি বাহির করা হইল। এই সকল ঘটনায় তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। ওহুদের যুদ্ধের দিনে তিনি সবচাইতে বেশী কষ্ট পাইয়াছিলেন হযরত হামযার বেদনাদায়ক শাহাদতের দরুন। হেন্দা তাঁহার কলিজা চিরিয়া চিবাইয়াছিল।

হযরত রসূল আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি যুদ্ধের ঘটনার কথাই ধরা যাক। সেনাবাহিনী এক জায়গায় তাঁবু গাড়িয়া অবস্থান করিতেছিল। হযরত রসূল আকরম (সঃ) তাঁহার তলোয়ার একটি গাছে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এক আরব এই তাকেই ছিল। সে তাঁহারই তলোয়ার উঠাইয়া লইয়া কহিল, হে মুহাম্মদ (সঃ)! এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে বাঁচাইতে পারে? দুশমনের হাতে তলোয়ার এবং তিনি ছিলেন নিরূপায়। কিন্তু তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের সহিষ্ণুতা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বলিলেন, "আমার আল্লাহ্।" ইহাতে তাহার (ঐ লোকটির) হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল।

বস্তুতঃ তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। হযরত রসূল আকরম (সঃ)-এর সারাজীবন মেহনত ও পরিশ্রমের মধ্যে কাটিয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতি খুব নরম ছিল। কিন্তু তাঁহাকে চরম ক্ষুধার মধ্যে কাটাইতে হইল। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনা সাধারণভাবে দারিদ্র, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। প্রত্যেকেই কষ্টের মধ্যে ছিল। একজন সাহাবী নিবেদন করিলেন, হুযূর! আমি এত ক্ষুধার্ত যে, আমি পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছি। বস্তুতঃ ইহাতে তিনি নিজের পেটের ওপর হইতে কাপড় সরাইয়া দিলেন। তিনি নিজের পেটে দুইটি পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই দিনগুলিতেই তাঁহাকে তাঁহার কোন কোন সন্তানের মৃত্যুর বেদনাও সহ্য করিতে হইল। তাঁহার সকল পুত্র সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন এবং যে সকল কন্যাসন্তান বড় হইল তাহাদের মধ্যে হযরত ফাতেমা ছাড়া বাকী সকলেই তাঁহার সম্মুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহাদের মৃত্যুতে তিনি কোন প্রকার অভিযোগ ব্যক্ত করেন নাই। বরং একবার তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইল, কিন্তু তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ নীরব ছিল।

কোন কোন সময় কোন কোন আপনজনের কথাতেও তাঁহার হৃদয় খুব ব্যথিত হইত। কিন্তু তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইতেন। হাদীসে আসিয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোকের পাশ দিয়া তিনি অতিক্রম করিতেছিলেন। সে কবরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ঐ কবর তাহার সন্তানের ছিল, যে অল্প বয়সে মারা গেল। তিনি তাহাকে বলিলেন, ধৈর্য ধর। ইহাতে সে জবাব দিল যে, তোমার উপর এইরূপ বিপদ আসে নাই, এইজন্য তুমি এইরূপ বলিতেছ। সে তাঁহাকে দেখে নাই। যখন তাহাকে বলা হইল যে, ইনি তো রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছিলেন, যাঁহার এক দুইটি নহে, সকল সন্তান শৈশবেই মারা গিয়াছে, তখন সে ক্ষমা চাওয়ার জন্য দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমি এখন ধৈর্য ধারণ করিতেছি। তিনি বলিলেন, প্রকৃত ধৈর্য তো বেদনার সূচনাতেই হইয়া থাকে। নতুবা কাঁদিয়া কাটিয়া তো যে কোন মানুষই ধৈর্য ধারণ করিয়াই নেয়।

এইভাবেই হযরত আয়েশার উপর অপবাদ লাগানোর ঘটনাও তাঁহার জন্য খুব দুর্বিসহ ছিল। কিন্তু তিনি এই কপট ও দুষ্কৃতিকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, যাহারা এফ্‌কের এই ঘটনার হোতা ছিল। দুইবার এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, তিনি মুসলমান বলিয়া কথিত লোকদের নিকট হইতে যারপরনাই কষ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দৃষ্টান্তের ভিত্তি ছিল পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। এইজন্য ইহা লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন মনে করি। একটি ঘটনা, যাহা সূরা মোনাফেকূনেও বর্ণনা করা হইয়াছে এই যে, মোনাফেকদের সর্দার আবী বিন আবী সলুল বাহ্যতঃ ইসলামের দাবীদার ছিল, কিন্তু ভিতরে

উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(অষ্টম কিস্তি)

ভক্তি শ্রদ্ধা ও মু'জেযার আতিশয্য

ভক্তি শ্রদ্ধা ও মু'জেযার আতিশয্য দেখাতে গিয়ে নবীগণের তথাকথিত অনুসারীরা এতো বাড়াবাড়ি করেছে যাকে সত্যের জঘন্যতম অপলাপ বলে গণ্য করা যায়। বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ্‌র নামধারী একটা বড় অংশের অবস্থাও তা-ই। এ নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে হুযূর (সঃ) ও ইসলামকে শুধু খাঁটোই করা হচ্ছে না বরং অযথা কলঙ্কিতও করা হচ্ছে। প্রকৃত মু'মিন আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে কিছু করেন না। নিজের খায়েশকে কখনও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দেন না। তাই তার ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্মে, চলন-বলন ভিত্তিহীন অযৌক্তিক আতিশয্যে আক্রান্ত বা ভারাক্রান্ত হয় না।

সাময়িক পত্রিকাদি হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো। তাতে দেখা যাবে কত আজে-বাজে কথা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হচ্ছে। অনেকেই তা বিশ্বাসের অংগ করে নিচ্ছে :

"আরব দেশে শেষ নবীর আবির্ভাব! এই খবর ছড়াইয়া পড়িলে সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। এক ইয়াহুদী এ খবর পেয়ে গেল আব্দুল মুত্তালিবের গৃহে। ইয়াহুদী শিশু নবীর পিঠে নবুয়ওতের চিহ্ন 'মোহরে নবুওয়ত' দেখে অজ্ঞান হলো। কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে আসলে, তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে অত্যন্ত দুঃখের সাথে উত্তর দিল হায়! ইসরাঈলের বংশ হতে নবুওয়ত বিদায় হল। সে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হে কুরাইশগণ! তোমরা তার জন্ম লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু প্রভুর কসম করে বলছি তিনি একদিন তোমাদের এইরূপভাবে আক্রমণ করবেন যে, দুনিয়ার সব দেশের অধিবাসীরা তা জানতে পারবে' [দৈনিক মিল্লাত/৯.১১.৯০/ কিশোর কাফেলা/ পরিচালক নকীব ভাই/ প্রিয় নবীর শিশুকাল– লেখক মুহাম্মদ মনির হোসেন]। বড়ই দুঃখের বিষয় যারা জন্মের সাথে সাথে নবী (সাঃ)-কে চিনতে পারলো দাবীর পর তারাই চিনতে পারলো না। তা'ছাড়া কুরআনে এ ধরনের ঘটনার কোন উল্লেখ তো নেই, ইংগিত আছে কিনা তা-ও আমাদের জানা নেই।

"হে নবী! আপনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।" এ আয়াতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, এ আয়াতে দিনগুলো বলতে ঐতিহাসিক ঘটনাসম্পন্ন দিনের কথাই বুঝানো হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হুযূর (সঃ)-এর মিলাদ দিবস হলো – একটি অন্যতম ঐতিহাসিক দিবস। কেননা, ঐ দিনেই তো পারস্যের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রজ্জলিত হাজার হাজার বছরের আগুন হঠাৎ নির্বাপিত হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর মিলনায়তন 'বায়তুল্লাহ্ শরীফ' সিজদায় ঢলে পড়ে; মা আমিনা আকস্মিক আলোক রশ্মি দিয়ে সুদূর রোম সম্রাটের প্রাসাদের অলৌকিকত্ব দেখতে পান। কাজেই নবীর ঐ মিলাদ দিবসকেই স্মরণ করার কথা বলা হইয়াছে" [মাসিক আল্ ফুরকান, মার্চ ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ২৬]।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্মদিন বিশ্ব ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্ববহ ছিল যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর কারণ নবী করীম (সঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ যা আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর নিকট নাযেলকৃত কুরআন মারফত পেয়েছি। যার সাথে তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নিষ্কলুষ ও অনুপম চরিত্রের সংযোগ ঘটেছে। এজন্যে যুক্তি প্রমাণহীন আজগুবি গাল-গপ্প উদ্ভাবনের বিন্দু মাত্রও প্রয়োজন পড়ে না। এসব দ্বারা বরং সমাজদেহ হতে তাঁকে বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের মাঝে 'ব্যবধানের পাহাড়কে' ক্রমাগত স্ফীত করা হচ্ছে।

মুহম্মদীয়া জামিয়া শরীফের মুখপত্র মাসিক আল বাইয়্যিনাত ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়, সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [৫, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ ঢাকা হতে প্রকাশিত] ৩-৪ পৃষ্ঠার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি : "সাইয়্যেদুল মুরছালীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর মোবারক এর মাথার চুল মোবারক থেকে পায়ের তালু মোবারক পর্যন্ত এমন কিছু ছিল না যেটা ফেলে দেয়ার মত যা নাপাক বা অপছন্দনীয়। দুররুল মোখতার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রসূল সায়েদুল মুরছালীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গামলা দিয়েছিলেন, সেই গামলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেশাব মোবারক ছিল। আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ থাকার কারণে বাইরে যেতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি এক পাত্রের মধ্যে এস্তেঞ্জা করেন এবং সকাল বেলা একজন সাহাবী (রাঃ)-কে বল্লেন 'দেখ এই পাত্রটা নিয়ে এমন এক জায়গায় ফেলবে সেই স্থানের উপর দিয়ে মানুষ হাঁটাহাঁটি করবে না। যদি কেউ পা মারায় তা হলে অবশ্যই ঈমানের ঘাটতি হবে এবং তার ক্ষতি হবে।' সেই সাহাবী (রাঃ) ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং বুঝতে পেরে সেটা নিয়ে রওনা হলেন। অনেক দূর চলে গেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে আশেপাশে কোন লোক আছে কিনা। দেখা গেল কোন লোকজন দেখা যায় না। উনি এক জায়গায় সেটা রাখলেন এবং রেখে চলে আসলেন। আসার পর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সেটা কোথায় রাখলে?" জবাবে সাহাবী (রাঃ) বললেন "হুজুর সেটা আমি এমন জায়গায় রেখেছি যা কেয়ামত পর্যন্ত কেউ মারাতে পারবে না। তিনি কথা বলছিলেন তখন তার মুখ দিয়ে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন আল্লাহ্‌র রসূল সাইয়্যেদুল মুরছালীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে ব্যক্তি তুমি কি সেটা পান করে ফেলেছ? তোমার মুখ দিয়ে সুঘ্রাণ বের হচ্ছে।" তখন সেই সাহাবী (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাঁ আমি সেটা পান করে ফেলছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেল" (সুবাহানাল্লাহ)। এবং কিতাবে লেখে সেই সাহাবীর (রাঃ) সাত পুরুষ পর্যন্ত যত সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল তাদের সবার শরীর থেকে আতরের ন্যায় ঘ্রাণ বের হতো । (সুবহানাল্লাহ)"

এসব নিয়ে প্রশ্ন তুল্লে ধর্মান্ধরা কাফের বলে ফতোয়া জারি করবে। এমন কি জিহাদ ঘোষণা করে মারমুখো হয়ে ওঠবে। তবু কিছু মন্তব্য না রেখে পারা যাচ্ছে না। হযরত রসূল করীম (সঃ) সাহাবী (রাঃ)-কে মানুষ হাঁটাহাঁটি না করে পাত্রটি এমন স্থানে ফেলে আসতে বলেছিলেন। এর ভিতরে যা আছে তা পান করতে বলেন নি। অনুমতি ছাড়া একাজ করা কি ঐ সাহাবীর উচিত হয়েছে? পেশাবে সুঘ্রাণ বা কল্যাণকর কিছু থাকলে হুজুর (সঃ) সবাইকে পেশাব পান করার কথা বলতেন। হয়তো (নাউযুবিল্লাহ্) নিজেও তা করতেন। ভারতের এককালীন প্রধান মন্ত্রী মুরারজি দেশাইর ওষুধ হিসেবে নিজের পেশাব পানের খবর পত্রিকাদিতে বের হতো। অনেক মুসলমান ভাইকে এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনেছি। তিনি কি দোষ করলেন? সাতপুরুষ পর সুঘ্রাণ বন্ধ হওয়ার কারণও বুঝা গেল না। হুযুর (সঃ) এরূপ সুগন্ধ হওয়ার নিয়ম-কানুন যদি শিখায়ে যেতেন তবে পৌরসভাগুলো অনেক উপকৃত হতো। সাহাবীর নাম পরিচয় লুকানোর কারণও অস্পষ্ট রয়ে গেলো।

মওলানা আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল কাদেরী প্রণীত "নূরে খোদা মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম' ২য় খণ্ড হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো। ৪৬ পৃষ্ঠার বইটিতে ক্রমিক নাম্বার দিয়ে শতাধিক বক্তব্য রাখা হয়েছে। ওসবের কয়েকটি এখানে নেয়া হলো (পুস্তকে উল্লেখিত ক্রমিক নম্বরসহ) যেমন : (২) এক ব্যক্তি তাহার মেয়েকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠাইবার সময় আতর তালাস করিয়া না পাইয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ছাল্লামের দরবার শরীফে হাজির হইলেন এবং আবেদন পেশ করিলেন। হুজুরে পাক উপস্থিত কোন আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য না থাকায় ঐ ব্যক্তির নিকট একটি শিশি চাহিলেন। হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম উক্ত শিশি হাতে নিয়া নূরানী শরীর মোবারক হইতে ঘাম মোবারক দ্বারা শিশি পূর্ণ করিয়া দিয়া ইরশাদ করেন, যাও ইহা তোমার মেয়ের শরীরে মলিয়া দাও। ছোবহানাল্লাহ! নূরানী ঘাম মোবারক উক্ত মেয়ের শরীরে লাগাইবা মাত্রই সমগ্র মদীনা শরীফ সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া গেল। এবং ঐ ঘরের নাম রাখা হইল–'বাইতুল সুতাইরেবিন' বা সুঘ্রাণের ঘর'। আফছুছ দুই পা বিশিষ্ট মানুষ নামের প্রাণী বলে–'নবী আমাদের মত মানুষ।' এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের চাইতেও অধম।" এখানেও কথিত সাহাবার নাম পরিচয় নেই। অথচ আল্লাহ্ ৪১ নম্বর সূরার ৭ আয়াতে বলেন, (বাংলা তর্জমা) তুমি বল, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমার মাবূদ একই মাবূদ; সুতরাং তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সাথে অবিচল থাক এবং তাহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং মোশরেকদের জন্য দুর্ভোগ।' আল্লাহ্র এ স্পষ্ট উচ্চারণকে কি করে অস্বীকার করা যায়? ওহী হলেই মানুষ আর থাকে না তা তারা কোথায় পেলেন? সব নবীই মানুষ ছিলেন বস্তুতঃ মানুষ নবীই মানুষের আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারেন। হয়ে আসছেন।

(৪) হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে ইহা বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ছাহাবী হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আসিতেন এবং হুজরা শরীফে হুজুরকে না পাইতেন তখন রাস্তায় যেখানে হুজুরে পাকের সুঘ্রাণ পাইতেন সেখানে তালাসে বাহির হইতেন। কেননা হুজুর নূরে মোজাছছম ছাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া ছাল্লাম যে রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিতেন হুজুরের গমনাগমনের কারণে রাস্তায় সুঘ্রাণ পাওয়া যাইত। মদীনা শরীফের যে যে গলিতে সুঘ্রাণ পাওয়া যাইত সাহাবাগণ সে সে গলিতে হুজুরের তালাসে বাহির হইতেন। আজও মদীনা মুনাওয়ারার দ্বার ও দিওয়ার হইতে সুঘ্রাণ আসে। নবীজীর সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইতেছে মুগ্ধ বিভোর হইতেছেন, আশেকগণের দ্বীন ও দেমাগ সুবাসিত হইতেছে। হে আমার আল্লাহ্! এই গরীব-দুঃখীও মুছাফীরের জন্য সেই মোবারক সুঘ্রাণ নসীব করুন।" [শুধু প্রথম প্যারাটি নেয়া হলো] এখানে হাদীসের কিতাবের নাম না দিলেও অন্ততঃ সাহাবী (রাঃ)-এর নামের উল্লেখ আছে। ১০/১২ বছরের মধ্যে হজ্জ করে এসেছেন এমন বেশ কিছু সংখ্যক হাজী সাহেবের সাথে আলাপ হয়েছে। সবাই বলেছেন তারা মদীনাতে এরূপ গন্ধের কোনই সন্ধান পাননি। তাই এ দাবী সত্য হিসেবে গ্রহণীয় নয়।

(৭) কতক হাদিছে আছে যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের পছিনা মোবারক হইতে গোলাপ ফুলের জন্ম।

পায়খানা মোবরক হইতে ফিরিবার সময় জমিন ফাটিয়া যাইত।

১০। যখন হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম পায়খানা করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন জমিন ফাটিয়া যাইত এবং জমিন হুজুরের প্রস্রাব ও পায়খানা মোবারক গ্রাস করিয়া ফেলিত এবং এ স্থান সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া যাইত।.....

এ ধরনের কাল্পনিক কেচ্ছাকাহিনীতে পুস্তকটি ভরপুর। কোরআনে এসব বিষয়ের কোন ইঙ্গিতও আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। হুযূর (সঃ) কবে থেকে সুঘ্রাণ সক্রান্ত মু'জেযার অধিকারী হয়েছেন এর কোন উল্লেখ নেই। নবুওয়ত প্রাপ্তির সাথে সাথে হয়ে থাকলে এ সুঘ্রাণ মক্কার অলিতে গলিতেও ছড়াত। তাছাড়া এতে শত্রুদের পক্ষেও হুযূর (সঃ)-কে খুঁজে বের করা খুবই সহজ হতো। সর্বোপরি মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত আরো অনেক বেশী বিপদসংকুল এমনকি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, হুযূর (সঃ) যে মহান আদর্শ ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এর তেমন কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। হুযূর (সঃ)-এর অনুগামী দাবী করে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর চমৎকার পথ। অথচ ঐ আদর্শ ও শিক্ষা তথা ইসলামকে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কাজে তিনি কতইনা দুঃখ-বেদনা, অত্যাচার-অবিচারের শিকার হলেন। এর সাথে সুঘ্রাণী মো'জেযা ও পসিনা হতে গোলাপের জন্ম হওয়ার দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যায় না। হুযূর (সঃ)-এর জন্মের বহু পূর্বেই গোলাপের জন্ম। এসবের প্রচার দ্বারা ইসলামকে দুনিয়ার সামনে যে কত হেয় করা হয় তা উপলব্ধি করার সামর্থ্যও এরা হারিয়ে ফেলেছে।

মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করিবার কারণ

৩৬। ইমাম বায়হাকী (রাঃ) দালায়েলের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এক ব্যক্তিকে ইছলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলিল– আমি ইছলাম গ্রহণ করিব না যে পর্যন্ত আপনি আমার মৃত মেয়েকে জীবিত না করিবেন। হুজুর নূরনবী নূরে খোদা ইরশাদ করিলেন–তুমি তোমার মেয়ের কবরটি আমাকে দেখাও। সে ব্যক্তি হুজুরকে সে মৃত মেয়ের কবরটি দেখাইল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ লোকটি বলিয়াছিল–আমি একটি মেয়েকে কুপের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছি। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করিলেন, তুমি ঐ কুপটি দেখাও। অতঃপর কুপটি দেখান হইলে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ মৃত মেয়েটির নাম ধরিয়া ডাক দিবা মাত্রই ঐ মেয়েটি উত্তরে বলিল–'লাব্বাইকা ওয়া ছাআদাইকা' অর্থাৎ, হাজির আছে গোলামীর জন্যে। তখন হুজুর ছরকারে দো-আলম ইরশাদ করিলেন–তুমি কি দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আসিতে পছন্দ কর? মেয়েটি উত্তর দিল– 'না' আল্লাহ্র কছম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমি আখেরাতকে দুনিয়ার চাইতে অধিক ভাল এবং উৎকৃষ্ট পাইয়াছি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে; রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন–তোমার মা-বাপ ঈমান আনিয়াছে, তুমি যদি চাও তোমাকে দুনিয়ায় আনিয়া দেই। মেয়েটি বলিল–'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা-বাপের দরকার নাই মা-বাপের চাইতেও আমার আল্লাহ্কে বেশী দয়াবান পাইয়াছি।' এ হাদিছের দ্বারা জানা যায় যে, মুশরেকদের সন্তানাদির উপর কোন আজাব নাই, যদি সে নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

৩৭। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলেদ্বয়কে জীবিত করার ঘটনারও ছিল অনুরূপ। একদিন রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত জাবের (রাঃ)-এর বাড়ীতে দাওয়াত রাখিয়াছিলেন। হজরত জাবের (রাঃ) একটি ছাগল জবেহ করিয়া তাঁহার বিবিকে পাকের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া স্থানান্তরে গেলেন। এদিকে জাবের (রাঃ)-এর বড় ছেলে ঘটনাক্রমে ছোট ছেলেকে ছাগল জবেহ করার অনুকরণে জবেহ্ করিয়া দিল। চীৎকার শুনিয়া তাদের মা দৌড়িয়া আসিলে বড় ছেলেটি ছুরি হাতে পালাইবার জন্যে ছাদে

উঠিল এবং ছাদ হইতে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিল। জাবের (রাঃ)-এর বিবি উভয় সন্তানের লাশ ঘরের কোনে চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিল এবং তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিলে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাহার বিবি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেও সেই মুহূর্তে তাহাদের মনে পড়িল যে, আল্লাহ্‌র হাবীবকে দাওয়াত করিয়াছে পুত্রশোকে কাতর হইলে নবীজীর খেদমতের ত্রুটি হইবে। কাজেই তাহারা ছবর এখতিয়ার করিয়া পুত্রশোক ভুলিয়া মেহমানদারীর আয়োজনে লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া ছাল্লাম চারিজন ছাহাবাকে নিয়া হজরত জাবেরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। খানা খাইবার পূর্বে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জাবেরের সন্তানদিগকে তালাস করিলেন। হজরত জাবের (রাঃ) ঘটনা প্রকাশ না করিয়া তাহারা কোথাও খেলিতে গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং নবীজীকে খানা খাইবার জন্য আরজ করিলেন। হুজুরে পাক তাহাদিগকে না লইয়া খানা খাইবেন না বলিলে জাবের (রাঃ) সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজাছছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম হজরত জাবের (রাঃ)-এর সন্তানদ্বয়ের পুনঃজীবনের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাক দিলেন। রাসূলে খোদার ডাক শুনিবামাত্রই জাবের তনয় এক এক করিয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠার মত উঠিয়া বসিল। তারপর হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া আহার সমাপন করিলেন। এই ঘটনা 'শাওয়াহেদুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

৩৮। তদ্রূপ ছিল হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের 'আব্‌ওয়াইন্ শারীফাইন' অর্থাৎ পিতা-মাতার জিন্দা করা এবং ঈমান আনয়ন করার বিষয়টি। যে রূপ আঁহাদিছ সমূহে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু মোহাদ্দেসীনগণ ঐ হাদিছের ছেহেতের মধ্যে কালাম করিয়াছেন। আর কিছু সংখ্যক মোতাআখ্‌খেরীন ঐ হাদিছসমূহকে প্রমাণ করতঃ দরজায়ে এতেবারে পৌঁছিয়াছেন।

৩৯। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনছারী যুবক অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার অন্ধ বৃদ্ধা মা ছিল। লোকজন তখন ঐ মৃত যুবকের শরীরের কাপড় পরাইবার পর তাহার মাতার সঙ্গে আফসোস করিতে লাগিল। অন্ধ বৃদ্ধা জিজাসা করিল –'সত্যই কি আমার ছেলে মারা গিয়াছে?' লোকজন উত্তর করিল–'হাঁ'! তৎপর ঐ বৃদ্ধা বলিতে লাগিল –'হে খোদা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমি তোমার খাতিরে এবং তোমার নবীর খাতিরে এই আশায় হিজরত করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাকে সাহায্য করিবে এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদে আমার প্রার্থনা শুনিবে। 'হে খোদা! আজ এই বিপদে আমাকে সাহায্য কর; আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর'! বর্ণনাকারী বলেন–আমরা এখনও সেই স্থান ত্যাগ করি নাই। মৃত ব্যক্তির মুখের কাপড় সরাইলে দেখা গেল যে, সে জিন্দা। তৎক্ষণাৎ সে যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের সঙ্গে খানা খাইল। ইহা ইবনে আদি ইবনে আবিদুদ্দুনিয়া, বায়হাকী ও আবু নাঈম বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঐ মেয়েলোকটির প্রতি নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুনজরের বরকত ছিল।

৬৮। উট, পশু-পাখী ইত্যাদি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদা করিত। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সহিত এক আনছারীর বাগানে তশরীফ নিয়া গেলেন; ঐ স্থানে একটি বকরি ছিল এবং বকরি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সেজদা করিল। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা বেশী হকদার যে, আমরা আপনাকে সেজদা করিবার। হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন–কোন মানুষের জন্য শোভা পায় না মানুষকে সেজদা করা হাদিছের শেষ পর্যন্ত।

৬৯। একবার এক উট নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে আসিয়া নিজ কওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, তাহারা এশার নামাজের পূর্বেই শুইয়া পড়ে। সে বলিল– আমার ভয় হয় যে, না জানি আল্লাহ্ পাক কোন সময় তাহাদের উপর আজাব নাজিল করেন। হুজুর পোন-নূর ইহা শুনিয়া ঐ কওমকে ডাকাইলেন এবং তাহাদিগকে এশার নামাজের পূর্বে শুইতে বারণ করিলেন।

৭০। ছাইয়্যেদাহ্ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন–আমার ঘরে ২টি বকরি ছিল। যখন হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমার ঘরে আরাম করিতেন, বসবাস করিতেন তখন ঐ বরকি নীরব রহিত, আরামে এবং শান্তিতে থাকিত। আর যখন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বাহিরে তশরীফ নিতেন তখন ঐ বরকি পেরেশান, বেকারারও বেহুঁশ হইয়া এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করিতে থাকিত। হায়! আফসোস! চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যে নবীজীর প্রেম ও ভালবাসা এতই প্রবল ছিল যে, সেই তুলনায় আজ মানুষের মধ্যে কতটুকু প্রেম আছে বা কী পরিমাণ থাকা উচিত তাহা পরিমাপ করিয়া দেখা প্রয়োজন। আর ওহাবী বদ্‌বখতরা তো জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

৭১। এক রেওয়ায়েতে যে, হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের যখন উট কোরবাণী করিতে যাইতেন তখন প্রত্যেকটি উট একে অন্যকে সরাইয়া হুজুর আনোয়ারের নিকটে আসিবার চেষ্টা করিত যেন হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রথমে উহাকে জবাহ্ করে। (চলবে)

–মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ ৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর
রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

আদর্শ মানব-হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মানুষ অনুকরণ প্রিয়। যে ভাষায় সে কথা বলে, যে পোষাক সে পরিধান করে, বস্তুতঃ যেভাবে সে তার জীবন যাত্রা নির্বাহ করে সবই অনুকরণের সমষ্টি। প্রতিটি মানুষই তার জীবনকে পরিচালনার জন্যে একটি আদর্শ বা নমুনার পিছু ধাওয়া করে। যদি সে তার জীবন পথের দিশারীকে সঠিক ভাবে চিনে নিতে পারে তবেই সুপথে পরিচালিত হয় এবং তার ইহ-পরকালের জীবন হয় সাফল্যমণ্ডিত।

মানব সম্প্রদায় যখন নানা গোত্র এবং জাতিতে বিভক্ত ছিল, পৃথিবীর এক অংশের সাথে আর এক অংশের যখন তেমন যোগসূত্র ছিল না তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে হয়েছে বিভিন্ন আদর্শের আগমন। এখন মানবগোষ্ঠী একই অঙ্গনে সমবেত হওয়ার চেষ্টা পাচ্ছে। ২৫ হাজার মাইলের ব্যবধান কোন ব্যবধানই নয়। জাতিতে জাতিতে আরম্ভ হয়েছে সৌহার্দ্য আর প্রীতির বন্ধন। তাই এক বিশ্ব-আদর্শের অভাব অনুভূত হচ্ছে। সে আদর্শ হবে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত ও বিশ্বজনীন, থাকবে না এর মধ্যে সাদা-কালো, উঁচু-নীচু, আমীর-গরীব, আছে-নাই এর কোন ভেদাভেদ। যে আদর্শে থাকবে সমস্ত স্তরের মানব গোষ্ঠির শিক্ষণীয় বিষয়। সমগ্র মানবজাতি পাবে তার মাধ্যমে মুক্তি এবং সারা জাহান পরিণত হবে একটি বেহেশ্‌তে।

ধর্মের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে মানবজাতির উদ্ধার কল্পে যুগে যুগে দেশে দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল। তাঁদের মধ্যে সবার সম্বন্ধে জানা না গেলেও আমাদের বিশ্বাস তাঁরা সবাই তাঁদের যুগের এবং তাঁদের জাতির জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সার্বজনীন এবং সর্বকালীন আদর্শ পাওয়া যায় না। আর না পাওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। বর্তমান কালেই মানবজাতি জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সুতরাং তাদের আদর্শ এবং শিক্ষারও প্রয়োজন সেই স্তরের। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। যেমন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শত ভাল শিক্ষক হলেও ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে পারবেন না। তাই মানবজাতি যখন প্রাইমারী স্তরে ছিল তখন তদনুযায়ী আদর্শের আগমন ঘটেছে। আর ঐ সমস্ত নবীগণ কখনো নিজেদেরকে সার্বজনীন ও সর্বকালীন আদর্শ বলে দাবীও করেন নি। তথাপি পরবর্তীকালে তাঁদের অনুসরণকারীরা তাঁদেরকে সার্বজনীন এবং সর্বকালীন আদর্শ বলে চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। নবীগণ সব সময়ই তাঁদের আগমনকে এক সার্বজনীন এবং সর্বকালীন আগমনের অগ্রগামীদল হিসেবে নির্দেশ করে গেছেন। বলেছেন, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত তিনি আসবেন না।

আমরা এতক্ষণ যে সার্বজনীন এবং সর্বকালীন আদর্শ মানবের ইঙ্গিত দিয়ে আসছি তিনি আর কেউ নন, তিনি সারওয়ারে কায়েনাৎ ফখরে মওজুদাত সাইয়্যেদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহ্‌মদ মুজতাবা খাতামান্নাবীয়ীন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। একমাত্র তাঁকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা' (৩৩:২২) অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। উত্তম আদর্শ হতে হলে একটি সত্তার মধ্যে যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার সব টুকুই আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ 'ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম' (৬৮ঃ৫) অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি [হে মুহাম্মদ (সঃ)] উত্তম আখলাকের অধিকারী। এমনকি আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে খাতামান্নাবীয়ীন বলে সমস্ত নবীদিগের আদর্শ বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

এটা সত্যি কথা যে, উত্তম আদর্শ বা উত্তম আখলাকের অধিকারী হতে হলে ঐশী আশিস ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তবুও মানব জীবনের সমস্যাবলীর সম্মুখীন হওয়া এবং তার মোকাবেলা করা এর মধ্যেই প্রতিভাত হয় উত্তম আদর্শের। মানব জীবনে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তার প্রত্যেকটির সুষ্ঠু সমাধান আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে পাই। এতটুকু ফাঁকের বা অভাবের অবকাশও সেখানে নেই। সমস্ত গুণের বিকাশ তাঁর মধ্যে হয়েছে এবং সেগুলোর চরম উৎকর্ষতা তিনি লাভ করেছেন। তাই মহাকবি সাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বালাগাল উলা বে কামালিহি, কাসাফাদ্দোজা বে জামালিহি, হাসুনাৎ জামিয়োঁ খেসালিহি সল্লো আলায়হে ওয়া আলেহি'। এখন আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব যে, তিনিই সত্যিকারের আদর্শ মানব, উত্তম আদর্শ – বর্তমান জগতের মানবগোষ্ঠীর মুক্তির-দিশারী।

নাবালকের আদর্শ

কেউ শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয় এবং কেউ পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা ভোগ করার পর পিতৃ-মাতৃহীন হয়। কিন্তু আমাদের প্রিয় আহমদ (সঃ) পিতৃহীন অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে তাঁর পিতা মারা যান এবং জন্মের ৬ বৎসর পর তাঁর মাতা মারা যান। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান মতে, যে-সমস্ত শিশু পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের হৃদয় খুব কঠিন হয় এবং তাদের ব্যবহার মার্জিত হয় না। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর বেলায় আমরা তাঁর ব্যতিক্রম দেখি। যে সমস্ত লোক তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা সকলেই তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। এতীম শিশুরা সাধারণতঃ জীবনে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রিয় এতীমের জীবনকে আমরা সব দৃষ্টিকোণ থেকেই সাফল্যমণ্ডিত দেখতে পাই। আমাদের মধ্যে যারা এতীম তারা এতীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন থেকে অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করতে পারে।

শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধের আদর্শ

একমাত্র এতীমদের জন্যেই নন, সকল শিশুর জন্যেই তিনি আদর্শ। তিনি প্রথম দাদার আশ্রয়ে এবং পরে চাচার আশ্রয়ে মানুষ হয়েছেন। তারা পরবর্তীকালে তাঁর পিতা-মাতার স্থান অধিকার করেছিলেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) কীভাবে গুরুজনের আদেশ-নিষেধ পালন করতেন, কীরূপ কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং কীভাবে বয়স্কদের সম্মান করতেন তা প্রত্যেক শিশুরই জানা উচিত।

নিজেদের জীবনে তাঁর আদর্শগুলির প্রতিফলন ঘটাতে পারলে তাদের সংসারকে তারা বেহেশ্‌তে পরিণত করতে পারবে। একটা ঘটনা বলছি। একদা হযরতের দুধ-মাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাঃ) আসলেন হুযূরকে দেখার জন্য। হুযূর (সঃ) তাঁর পাগড়ী বিছিয়ে দিলেন মাতার জন্য। মিষ্টি ব্যবহারে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। নূরনবীর এ আদর্শ কি আমাদের প্রত্যেক শিশুরই গ্রহণ করা উচিত নয়?

শুধু শিশু-যুবক বা বৃদ্ধদের আদর্শই তিনি নন। তিনি সকল বয়সের লোকদের জন্যেই আদর্শ। কৈশোরে কখনো বৃথা সময় নষ্ট করেন নি তিনি। কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তাঁর শত্রুও তুলতে পারবে না। যৌবনে বিপথে তিনি যান নি। বৃদ্ধকালে তিনি কর্মঠ এবং নিরলস জীবন যাপন করেছেন। আলস্য কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই তিনি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

নিঃসঙ্গ জীবনের আদর্শ মুহাম্মদ (সঃ)

আরব দেশের জলবায়ু উষ্ণ হওয়ার দরুন সেখানের লোকদের যৌবন অল্প বয়সেই শুরু হয়। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) সে দেশের অন্নপানিতে পুষ্ট হয়েও ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর এই জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্রময়। সেকালে আরবের লোকেরা পানির মত মদ খেত। কিন্তু আমাদের প্রিয় হযরত কোনদিন মদ স্পর্শও করেন নি। একথা হযরতের জীবনীর কঠোর সমালোচক বহু খ্রীষ্টান, ইহুদী লেখকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কুমার মুহাম্মদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

বিবাহিত জীবনের আদর্শ

হযরতের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হয় ২৫ বৎসর বয়সে। মানব জীবনের এ সময়টা এমনি একটি পরীক্ষার সময়, যুবক মাত্রই এ কথা উপলব্ধি করে থাকে। এ সময় তিনি বিয়ে করলেন ৪০ বৎসর বয়স্কা বিগত যৌবনা এক নারীকে। নাম তাঁর খাদীজাতুল কোব্‌রা (রাঃ)। সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন তিনি। এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন পরবর্তীকালে। কিন্তু তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হয় বিধবা নয় তালাকপ্রাপ্তা। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বিয়ে করেছিলেন নিজের নফসানি খাহেশের জন্যে নয় বরং তাঁদের অনুরোধ রক্ষাকল্পে। **সে সময় আরব দেশে মেয়েদেরকে জন্তু জানোয়ারের শামেল মনে করা হতো। হযরত তাঁদের সম্মানের আসনে সমাসীন করলেন। নারী পেল পুরুষের সমমর্যাদা। তিনি তাঁর সব স্ত্রীদের সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন এবং তাঁদেরকে এত ভালবাসতেন যার তুলনা বিরল। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে উত্তম।"** তিনি তাঁর সহধর্মীণীদের প্রহার করা দূরে থাকুক তাঁদের প্রতি কোনদিন কর্কশ বাক্যও ব্যবহার করেননি। পক্ষান্তরে তাঁর সহধর্মীণীরাও বিরল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে হযরত (সঃ) এত বেশী ভাল বাসতেন যে, তিনি জীবিত থাকা কালীন অর্থাৎ হুযূরের ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁর একমাত্র কুমারী-স্ত্রী। তিনি বলেছেন, "আমি খাদীজা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি এত ঈর্ষাভাব পোষণ করি নি। কেননা, নবী করীম (সঃ) সব সময় তাঁর প্রশংসামুখর ছিলেন।"

বিবি খাদীজার স্মৃতি তাঁর মনে এত জাগরূক ছিল যে, তিনি কখনও কোন পশু যবাই করলে তার কিছু অংশ উপহারস্বরূপ বিবি খাদীজার বান্ধবীদের মধ্যেও বিলি করতেন।

আঁ হযরত (সঃ) সব সময় তাঁর বিবিদের সম্মান দেখাতেন। কখনও তাঁদের অপমান হয় এমন কাজ করতেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ "কোন কোন সময় নবী করীম (সঃ) ঘরে প্রবেশ করতেন, আমি আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলতাম। তাঁকে দেখে আমার বান্ধবীরা সরে যেতে ইচ্ছা করতো। হুযূর তাঁদের যেতে বারণ করতেন এবং আমাদেরকে খেলতে বলতেন।"

হুযূর (সঃ) যখন ভ্রমণে যেতেন তখন বিবিদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন। অনেক সময় গৃহ-কর্মেও তিনি বিবিদেরকে সাহায্য করতেন।

ইহুদী এবং হিন্দুদের মতে ঋতুবতী নারীকে অপবিত্রা মনে করা হতো। তাকে খাবার ঘর, পাকের ঘর এমন কি স্বামীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করতে পর্যন্ত দেয়া হতো না। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দেন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর বিবিদের সাথে এক বিছানায় থাকতেন, এক পাত্রে তাঁদের সাথে পানাহার করতেন। তাঁর আগমনের পূর্বে নারী পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির অধিকারীণী ছিল না। তিনি নারীকে পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার করে দিলেন।

তাঁর স্ত্রীগণও তাঁকে এত ভালবাসতেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর সাথে প্রথমে মিলিত হওয়ার জন্যে সবাই আশা পোষণ করতেন। মোট কথা তিনি ছিলেন নারী-ত্রাতা। নারীকে তিনি পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে তুলে পুরুষের সমমর্যাদায় ভূষিত করেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নারীদের সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর অনুসরণকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে আকৃষ্ট করেছেন। নারী-ত্রাতা মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি হাজারো সালাম।

জনক-জননীর আদর্শ

হযরত নবী করীম (সঃ)-এর অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। তাঁদের শারিরীক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর এবং সুষ্ঠু করার জন্য তিনি বেশ দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি শিশুদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁদের সাথে উত্তম আচার-আচরণ করতেন। তিনি সর্বদা বলতেন: "শিশুদেরকে সম্মান দেখাও"। তাঁর সুশিক্ষার ফলেই তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) উন্মুল জান্নাত বা জান্নাত-জননী আখ্যা পেয়েছিলেন।

পিতামাতার কাছে সন্তানের মৃত্যুর মত হৃদয় বিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে! হযরতের জীবদ্দশায় একজন ব্যতিরেকে তাঁর সকল সন্তানগণই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের মৃত্যুতে যে ধৈর্য এবং স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সবারই অনুকরণীয়। তাঁর নীতি হল – "তিনি (আল্লাহ্) যা দিয়েছেন তা-ও তাঁর এবং যা নিয়েছেন তা-ও।" কখনো কখনো তিনি তাঁর ব্যথিত মনকে ঐশীবাণী দ্বারা সান্ত্বনা দিয়েছেন – "নিশ্চয় সবকিছু আল্লাহ্‌র এবং তাঁর দিকেই সব প্রত্যাবর্তিত হবে।"

তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের জীবন প্রদীপ নিবু-নিবু। তিনি তাঁর হাঁটুর উপর মাথা রেখেছিলেন। গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর এক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের (রাঃ) কাছে এ দৃশ্য অদ্ভুত লাগল। তিনি বল্লেন, হুযূর আপনিও? হুযূর (সঃ) তাঁকে বললেন: "হে আউফের সন্তান, ইহা স্নেহ ও মমতার নিদর্শন। যদিও হৃদয় ভারাক্রান্ত চক্ষু অশ্রু প্লাবিত তবুও তাঁর যা ইচ্ছে আমাদের তাতেই রাজী থাকা উচিত। নিশ্চয়ই আমরা সব আল্লাহ্‌র এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাব।" হযরতের এ কথা থেকে আমাদের প্রত্যেক সন্তান-হারা পিতামাতার শিক্ষা নেয়া উচিত।

আত্মীয়-স্বজনের আদর্শ

হযরত তাঁর অমুসলমান আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন – বস্তুতঃ যারা ইসলাম কবুল করেনি তারা আমাদের মু'মিন ভাই নন। কিন্তু যেহেতু তারা আমার আত্মীয় তাই আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে থাকি। হুযূর আরও বলেছেন – যারা আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তারা আমার দলের নয়। এখানে একটা বিষয় চিন্তা করার আছে। অমুসলিম বলে যদি তিনি তাদের সাথে সম্বন্ধচ্ছেদ করতেন তাহলে ঐ সমস্ত লোকদের কোন দিনই ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য হ'ত না। আমরা যারা আহমদীয়তে বয়াত গ্রহণ করেছি আমাদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

বন্ধুর আদর্শ

হযরত রসূলে করীম (সঃ) কখনো কোন বন্ধুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। সর্বদা তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর আনসারগণ ভেবেছিলেন এবার বুঝি তাদের প্রিয়বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ) মদীনা ছেড়ে মক্কায় বসবাস করবেন। কিন্তু তিনি তাদের এ ধারণা দূর করে দিলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, তিনি তাঁদের সাথে মদীনায়ই থাকবেন। তিনি তাঁর ওসীয়্যত নামায় তাঁর উত্তরাধিকারীদিগকে এই বলে নসিহত করে গিয়েছেন যে, আনসারদের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। সর্বোপরি তিনি তাঁর পরম বন্ধু যিনি সমস্ত আপদে-বিপদে তাঁকে সাহায্য করেছেন ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে ভুলেননি। সুখে-দুঃখে সব সময়ই তিনি তাঁর বন্ধুকে স্মরণ রেখেছেন। ইয়া হাবীব সালামু আলায়কা।

প্রতিবেশীর আদর্শ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং সমাজের আর দশজনের সাথে সে একসূত্রে বাঁধা। এক প্রতিবেশীর হক অপর প্রতিবেশীর নিকট সবচেয়ে বেশী। হুযূর (সাঃ) বলেছেন, "প্রতিবেশী সম্বন্ধে আমাকে এত বেশী বলা হয়েছে যে, আমার ভয় হয়েছে যে, পাছে প্রতিবেশীকেও সম্পত্তির অংশীদার করে দেয়া হয়।" হুযূর (সঃ) প্রতিবেশীর হক পালনের জন্য অনেক বেশী তাগিদ করেছেন। তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনেও তা পুরোপুরিভাবে পালন করে দেখিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর বিবিদের তরকারীতে বেশী ঝোল রাখতে বলতেন, যাতে প্রতিবেশীদেরকে কিছু দেয়া যায়। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায় তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।" আশ্চর্যের বিষয় আমাদের মধ্যে এ হুকুম পালনার্থে বিশেষ কোন সাড়া নেই। হুযূরের এ সামান্য কথাটুকুর প্রতি পুরোপুরি আমল করলে বর্তমান দুনিয়ায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ধনীর সাথে গরীবের এবং এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠতে পারে।

গরীব এবং মজুরের আদর্শ

প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদার অভাব দেখা যাচ্ছে। তারা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে তবুও মানহানির ভয়ে সাধারণ কাজকে অবহেলা করবে।

হুযূর (সঃ) মক্কায় সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন দৈহিক কাজ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। নিজের কাজ নিজে করতে তিনি গৌরব বোধ করতেন। তিনি বলতেন, "সবচেয়ে হালাল খাদ্য তা' যা কোন ব্যক্তি স্বহস্তে উপার্জন করে।" বাল্যকালে সামান্য মজুরীর বিনিময়ে তিনি মক্কায় মেষ চড়িয়েছেন। যৌবনে তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর অধীনে চাকুরী করেছেন এবং পরবর্তীকালে ব্যবসার পরিচালক হয়েছেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে একজন চাকুরীজীবির আদর্শ রেখে গেছেন।

দারিদ্রের নির্মম তাড়নায় ও কষাঘাতে মানুষ অপরের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় নানা প্রকার ছলনা এবং খারাপ পথ অবলম্বন করতে। বাংলায় একটা কথা আছেঃ "অভাবে স্বভাব নষ্ট।" কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী করীম (সঃ) এ সমস্তের উর্ধ্বে ছিলেন। দারিদ্রের নির্মম আঘাতকে তিনি অবিচলচিত্তে সহ্য করেছেন এবং নিজ চরিত্র বলে দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। তাঁর ঘোরতর শত্রুও তাঁকে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যখন তিনি কারো কাছ হতে কিছু টাকা ধার নিতেন সময় মত কিছু লাভ সহ তা ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে সব সময় ঘৃণা করেছেন। এক ভিক্ষুককে তিনি কুঠার কিনে দিয়ে জীবনের জন্যে তাকে ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে'।

পূর্বেই বলেছি, "অভাবে স্বভাব নষ্ট।" আমাদের দেশের গরীবদের আমরা দেখতে পাই নোংরা ময়লা কাপড়-চোপড় পরিধান করতে। স্বাস্থ্য রক্ষার সামান্যতম নিয়মও তারা পালন করে না। কিন্তু হুযূর (সঃ)-কে আমরা দেখতে পাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এক মূর্ত প্রতীক হিসাবে। মোটা কমদামী কাপড় পড়তেন কিন্তু সর্বদা পরিষ্কার রাখতেন। দিনে কয়েকবার দাঁত পরিষ্কার করতেন। মাথার চুল পরিপাটি করে রাখতেন। খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত মুখ ধৌত করতেন। তিনি বলতেন ঃ "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।" পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বিশেষ টাকা পয়সার দরকার হয় না, শুধু চেষ্টা থাকলেই হয়। এই ছিলেন আমাদের মহানবী (সঃ) গরীব এবং মজুরের আদর্শ। তাঁকে অনুসরণ করলে দারিদ্রতা সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা যায়।

ধনীর আদর্শ

বিবি খাদীজার (রাঃ) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর বিবি খাদীজা তাঁর সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য হুযূর আকরম (সঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েও তিনি আরাম-আয়েশের তাবেদার হননি। তিনি পূর্বের মত সরল জীবন যাপন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর বিবিদের নিম্নমানের জীবন যাপনের জন্য যা দরকার শুধু তা-ই দিতেন। বাড়তি অর্থ গরীবের উপকারে, ক্রীতদাস মুক্তির কাজে এবং জাতির অন্যান্য সমস্যাবলী দূর করার জন্য ব্যয় করতেন। তিনি গরীবের উপকারে অকাতরে অর্থ বিলিয়ে দিতেন। কখনো ভাবতেন না যে, তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে, বরং তিনি সব সময় ভাবতেন পাছে অর্থ-সম্পদ তাকে দুনিয়ামুখী করে তুলে। আঁ হযরত (রাঃ) এই বলে ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর বিবিদের অংশ বন্টনের পর যা থাকে তা যেন গরীবদের মধ্যে বিলি করা হয়। সারা দুনিয়ার আইন সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র উদাহরণ যিনি অব্যবহৃত সম্পদের উপর যাকাতের মত একটি বিশেষ ট্যাক্স ধার্য করেছিলেন। যদি বর্তমান যমানার বিত্তশালীগণ হুযূর (সঃ)-এর শিক্ষার অনুসরণ করত তাহলে দুনিয়াকে কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজমের বিপদের সম্মুখীন হতে হত না।

কর্মকর্তা এবং মালিকের আদর্শ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, "আমি আমার দশ বৎসর বয়স থেকে হুযূর (সঃ)-এর খেদমত শুরু করি এবং হযরতের মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ দশ বৎসর খেদমত করি। কিন্তু কোনদিন তিনি আমাকে কটূক্তি করেন নি বা আমার সাথে গরম মেযাজে কথা বলেন নি। আমি বালক ছিলাম, আমাকে কোন জরুরী কাজে পাঠান হলে, ভুলে আমি রাস্তায় বালকদের সাথে খেলা শুরু করে দিতাম। নবী করীম (সঃ) পিছন থেকে আসতেন এবং আদরের সাথে আমার মাথা বা কানে মৃদু আঘাত করতেন।" বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ সাক্ষ্য, হযরত কোনদিন তাঁর কোন খাদেমকে আঘাত করেন নি।" বিবি খাদীজা (রাঃ) তৎকালীন প্রথা অনুসারে নবী করীম (সঃ)-কে যায়েদ নামে একটি দাস উপঢৌকন দেন। একদা যায়েদের পিতা এবং ভাই হুযূরকে অনুরোধ করলেন যায়েদকে মুক্তি দেয়ার জন্যে। হুযূর (সঃ) যায়েদকে মুক্তি দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ) যায়েদকে এত ভালবাসতেন যে, যায়েদ নবী করীমের (সঃ) কাছে থাকাই পসন্দ করলেন। এ ছাড়াও নবী করীম (সঃ) বিভিন্ন সময়ে মজুরদের দিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা-ই খেতে দাও। যা পড় তাদের তা-ই পড়তে দিও। তাদের গায়ের ঘর্ম মুছবার পূর্বেই তাদের পাওনা দিয়ে দিও। মালিক পক্ষ বা শ্রমিক পক্ষ যদি সত্যিকারভাবে নবী করীমের আদর্শ অনুসরণ করত তবে বর্তমান কালে মালিক-শ্রমিকে, প্রভু-ভৃত্যে এ রকম সংঘর্ষ দেখতে পেতাম না।

ব্যবসায়ীর আদর্শ

জীবন প্রভাত থেকেই আমরা দেখতে পাই চাচার সাথে ব্যবসায়ী মুহাম্মদকে সিরিয়া দেশে। কখনো তিনি বেশী দর-কষাকষির মধ্যে যান নি। কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করেন নি বা কারও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতারিত করেন নি। সত্যতা এবং সত্যবাদিতাই ছিল তাঁর ব্যবসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই তিনি বিশেষ লাভবান হতেন। তিনি সৎ ব্যবসার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছেন, "এক সৎ ব্যবসায়ী নবীদের সাথী।" ব্যবসায়ীরা যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তবে তাদের ব্যবসা বিভিন্নভাবে বর্দ্ধিত হবে এবং দুনিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। ব্যবসায়ী মুহাম্মদের প্রতি সালাম।

নাগরিকের আদর্শ

নাগরিক হিসাবে তিনি একজন সত্যিকারের আদর্শ পুরুষ। তিনি কখনো ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র নায়কের বিরোধিতা করার শিক্ষা দেন নি। যখন তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালান হলো এবং তা চরমে গিয়ে পৌছল তখন তিনি তাঁর সহকারীদিগকে প্রথমে ইথিওপিয়া এবং পরে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। যতদিন পর্যন্ত তিনি মক্কায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত 'কিলের বদলে কিল'– এ রকম যত প্রস্তাব এসেছে তা তিনি প্রত্যাখান করেছেন। যখন তাঁর কয়েকজন সাহাবী তাঁকে অস্ত্র ধরার জন্য অনুরোধ জানালেন তখন তিনি উত্তর দিলেন ঃ "তোমাদের কি হস্ত নিবৃত্ত রাখার জন্যে আদেশ করা হয়নি।"

যদি নাগরিকগণ নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করেন তবে আজকালকার নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবসান হয়ে গণজীবনে শান্তির ছায়া নেমে আসতে পারে।

নবী করীমের নাগরিক চেতনা এত বেশী তীক্ষ্ণ ছিল যে, পথে চলতে পথের মাঝে গাছের ছোট ডাল বা পাথরের কুঁচি দেখতে পেলে নিজ হাতে তা সরিয়ে দিতেন পাছে তাতে কেউ কষ্ট পায়। তিনি রাস্তাঘাটকে প্রশস্ত করার জন্যে এবং রাস্তায় নোংরা ময়লা না ফেলার জন্যে আদেশ জারী করতেন। রাস্তায় পথিকদের যাতায়াতের পথ যাতে বন্ধ না করা হয় সেজন্যে তিনি তাগিদ দিতেন এবং বলতেন যে, রাস্তার হক আদায় করো। নাগরিক মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ জয়ী হউক।

শাসকের আদর্শ

আরবের শাসনকর্তা হিসাবে নবী করীম (সঃ) কখনও নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য লালায়িত হন নি। কখনও তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। বদরের যুদ্ধে তিনজন কোরেশ সৈন্য তাঁদের প্রতি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করলে তিনি তাঁর নিকট আত্মীয় আলী (রাঃ), হামজা (রাঃ) এবং ওবায়দা (রাঃ)-কেই তাদের সম্মুখীন হতে আদেশ দেন। তাঁদের তিন জনেরই জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি অন্যান্য কোরেশদের "তোপের" মুখে ঠেলে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। হযরত ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

তিনি একজন ন্যায়-বিচারক ছিলেন। একবার কোন এক অপরাধীর পক্ষ নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহচর হযরত ওসমান (রাঃ) কিছু বললেন। কিন্তু হযরত তার পক্ষে রায় না দিয়ে বলেন, "হে উসমান, তুমি কি আল্লাহ্র আইনের উপর হস্তক্ষেপ করার প্রস্তাব করছ? বস্তুতঃ মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে সে হাত কাটা থেকে রেহাই পাবে না।"

সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহ্রা মনে করেন যে, প্রজারা তাদের দাস। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) বলতেন, "রাষ্ট্র প্রধান প্রজাদের দাস ছাড়া কিছুই নয়।" তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। তিনি কখনো পসন্দ করতেন না যে, কেউ তাঁর প্রশংসা করে বা তাঁকে তোষামোদ করে। একদা এক লোক তাঁর সামনে ভয়ে কাঁপছিল। তিনি বললেন, "আমি এক বিধবার নন্দন মাত্র, যে দারিদ্রের তাড়নায় শুক্না গোশ্ত খায়।"

অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্র ন্যায় তিনি বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেন নি! তিনি সময়মত তাঁর সব কাজকর্ম করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতেন, জুমুআ এবং ঈদের নামাযে ইমামতি করতেন, খুতবা দিতেন, হজ্জ এবং ওমরা করতেন, নিজে সেলাই করতেন, সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিতেন, বিবিদের খাওয়ার তৈরীর কাজে সাহায্য করতেন। গরীবদের সাথে খেতেন, সৈন্য সংগ্রহ এবং চালনা করতেন, সৈন্যদেরকে হুকুম দিতেন। গরীব এবং দাসদের কাজ করে দিতেন এবং দৈনন্দিন অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিজ হাতে করতেন। সারাদিন হাঁড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর মানব শরীর রাত্রে আরাম চায়, কিন্তু তিনি সামান্য বিশ্রামের পর সারা রাত্র দাঁড়িয়ে মাওলার দরবারে প্রার্থনা করতেন, এমন কি কখনো কখনো তাঁর পা ফুলে যেত।

তাঁর বাড়ীতে কোন পাহারার বন্দোবস্ত ছিল না। সবাই বিনা দ্বিধায় তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করতো। তিনি কখনো কখনো হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-দের আদেশ করতেন গরীবদের ডাকার জন্য। তিনি তাদের দুধ এবং খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। প্রত্যেক সন্ধ্যায় মসজিদ থেকে তিনি কোন গরীবকে নিয়ে

আসতেন এবং তার সাথে আহার করতেন।
রাজকোষকে কখনো তিনি নিজের বলে মনে করতেন না। একদিন তিনি উটের গা থেকে কিছু লোম ছিড়ে নিলেন এবং বললেন : "আমার প্রাপ্য ছাড়া এ রকম একগাছি লোম নেবার অধিকারও আমার নেই।"
জাতীয় পরিকল্পনায় তিনি একজন সাধারণ লোকের মত কাজ করতেন। যখন মদীনায় মসজিদ তৈরী হচ্ছিল, তিনি পাথর টানার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এ দৃশ্যে এক আনসার কবি গেয়ে উঠেছিলেন: "ইহা কি খারাপ এবং দুঃখর কথা নয় যে, নবী (সঃ) কাজ করবেন আর আমরা বসে থাকব?"
খন্দকের যুদ্ধের সময় নবী করীম (সঃ) যখন পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন তখন এক সাহাবী তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর পাথর বাঁধা শূন্য পেট নবী করীম (সঃ)-কে দেখালেন। নবী করীম (সঃ) নিজের পেট উন্মুক্ত করে দেখালেন যে, সেখানেও দ্বিগুণ পাথর বাঁধা আছে।
তাঁর শাসনামলে কোন দস্যু-তস্করের ভয় ছিল না। এই ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর শাসন ব্যবস্থা। সারা দুনিয়ায় তাই কায়েম হোক। শাসক মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সালাম।

ভাগ্যবানদের আদর্শ

কোন এক সময় ছিল যখন হযরত নবী করীম (সঃ) জগতের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু এমন এক সময় আসল যে, তিনি সারা আরব জাতির নেতা হলেন। মাথায় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে সাথে করে মক্কা থেকে মদীনার হিজরত করলেন। কিন্তু ১০ বৎসর যেতে না যেতেই দশ হাজার সহচর নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। দুঃখের সময় নিরুৎসাহ হননি তিনি বা আনন্দের সময় আত্মহারাও হন নি। সব কিছুতেই একটা সমতা দেখতে পাই আমরা তাঁর জীবনে। চরম দারিদ্রে আমরা দেখতে পাই পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মসম্মানে সম্মানিত। চরম আনন্দেও আমরা দেখি তাঁকে আত্মনিয়ন্ত্রণের এক চরম আদর্শ হিসাবে। রাজা বাদশাহ্গণ সাধারণতঃ কোন দেশ জয়ের পর বিপুল আনন্দ উৎসবে মেতে যান, কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর মক্কা বিজয়ের পর আমরা তাঁর মধ্যে তেমন আত্মহারা হওয়ার কোন ভাব দেখতে পাই না। কেবলমাত্র শুক্নো রুটি ও পানি দ্বারা তিনি মক্কা বিজয়ের ভোজ সম্পন্ন করেছিলেন। জয় মুহাম্মদ (সঃ)-এর জয়।

সংস্কারকের আদর্শ

একটি সত্যিকারের সংস্কারকের মধ্যে সদিচ্ছা এবং সহানুভূতি এই দু'টি গুণ থাকা চাই। আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে এর কোনটিরই অভাব ছিল না। যার ফলে তিনি রাতারাতি আরবের অসভ্য, বর্বর জংলী মানুষগুলিকে পরিণত করে দিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী এবং গুণীতে। তাদের মনের মধ্যে নারী অবহেলার পরিবর্তে সৃষ্টি হল নারীর জন্য প্রেম, আর মদের টান পরিবর্তিত হল মানুষ এবং মানুষের প্রভুর টানে। যে তলোয়ার ব্যবহৃত হত তার ভাইয়ের রক্ত ক্ষরণের জন্য সেই তলোয়ার ব্যবহৃত হ'ল তার ভাইয়ের জীবন রক্ষার্থে। এটাই ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে সবচেয়ে বড় মো'জেযা। কি সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এগুলি সম্ভব হয়েছিল তাই এখন বলছি।
অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত মানবতার মঙ্গলের দিকটাই তিনি বেশী বড় করে দেখতেন। শুধুমাত্র কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না। নিজের জীবনে তিনি সে কথা কাজে পরিণত করতেন। শুধুমাত্র বিবি প্রদত্ত দাসকে মুক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। অসংখ্য ক্রীতদাসকে তিনি আজাদ করে দিয়েছেন। তিনি সর্বকালের দাসত্বের শৃঙ্খলকে এমনভাবে ভেঙ্গে দিয়েছেন যে, মানবতার দুয়ারে এই কুপ্রথা আর কোন দিনই ঠাঁই পাবে না। মানুষ মানুষকে ঘৃণার বদলে সম্মান করতে শিখেছে। মানুষ বুঝেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এর সবটুকুই নবী করীম (সঃ)-এর চেষ্টার ফল। তিনি নিজ ভগ্নী যয়নাবকে পালিত পুত্র এবং মুক্তদাস যায়েদের কাছে বিবাহ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ক্রীতদাসগণ নিজ গুণে বাদশাহর কন্যাদের বিবাহ করতে পেরেছেন এবং এমনকি সিংহাসনও অলংকৃত করতে পেরেছেন। এ শুধু মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষারই ফল।
মানুষকে ভালবাসার দাবী কেবল মুখে প্রচার করলেই হয় না। নিজেদের জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে হয়। আঁ হযরত (সঃ) নিজের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখিয়ে গেছেন মানুষকে কীভাবে ভালবাসতে হয়। কীভাবে তাদের দুঃখ মোচন করতে হয়। সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি গরীবের মত থাকতেন এবং সব সময় দুর্ভাগাদের বন্ধু হিসাবে কাজ করে গেছেন। আজকাল যারা বড় বড় সংস্কারক বলে দাবী করছেন তাদের প্রত্যেকের উচিত মুহাম্মদের মত নিজেদের বুলির সাক্ষ্য হিসাবে নিজেদের কর্ম জীবনকে পেশ করা। সংস্কারক মুহাম্মদের (সঃ) আদর্শ চিরঞ্জীবী হউক।
দুনিয়ার সব কিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে সাধু সাজা সোজা। কিন্তু এতে দুনিয়ার কোন উপকার হয় না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে, এ দুনিয়া সমস্ত ভোগ-বিলাস-আরাম-আয়েস ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করলেই মানব-জন্ম সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়। এ ধারণা মানব মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, খ্রীষ্টনগণ গর্বের সাথে যীশু খৃষ্টের নিম্নবাণী উচ্চারণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতোঃ
"কিন্তু আমি অবিবাহিত এবং বিধবাদের বলি তারা যেন আমাকে অনুসরণ করে এবং এটাই তাদের জন্যে মঙ্গল" অর্থাৎ তারা যেন বিবাহ-সাদী, ঘর-সংসার না করে। এই যদি মানব মুক্তির পথ হয় তবে এমন একদিন আসবে যে, দুনিয়া থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে এবং প্রকৃতপক্ষে সাধক সম্প্রদায়েরও হবে যবনিকা পতন।
কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) করলেন এ ধারণার বিরোধিতা। তিনি বললেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তিনি হলেন পুরোপুরি সংসারী। বিয়ে-সাদী করলেন। সন্তানাদি জন্ম দিলেন। মানুষের সাথে মিশলেন। মানুষকে উপদেশ দিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করলেন। রাজ্য চালালেন। কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্তার অনন্ত প্রেম ও ভালবাসা যেমন পারস্য কবি গেয়েছেনঃ **"হাতে কাজ মনটা প্রিয়ার কাছে।"** তাঁর কঠোর শত্রুও একথা স্বীকার করেছিল যে, "মুহাম্মদ আপন প্রভুর প্রেমে বিভোর হয়েছে।"
কিন্তু অন্যান্য সাধকের মত তিনি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। মৌমাছিদের মত নিজেই কেবল মধু পান করেন নি। সব সময়ই মানবজাতিকে খোদা প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য চেষ্টা করেছেন এবং এত বেশী চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর প্রভু বলেছেন: "তুমি কি নিজে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে এই জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না?"
তিনি সারাদিন হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতেন, রাত্রে নিজ প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাতেন আর বলতেন, "যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই সৃষ্ট আর যদি তুমি তাদেরকে

ক্ষমা কর তুমি তো তাদেরই প্রভু এবং সর্বজ্ঞানী।" রাত্রে সামান্য সময়ই তিনি নিদ্রা যেতেন। কিছুক্ষণ পর পরই তিনি উঠতেন আর আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতেন। বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "মাঝে মাঝে আমি নবী করীম (সঃ)-কে বিছানায় পাইনি, হাতড়িয়ে দেখেছি তিনি সেজদায় আছেন। বিছানার কাপড় চোখের পানিতে ভিজে গেছে। রাত্রে দাঁড়িয়ে প্রভুর আরাধনা করতে করতে তাঁর পা ফুলে যেত। আমি বলেছি, "খোদা তো আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, তবু আপনি এত কাঁদছেন কেন?" হুযূর (সঃ) বলতেন, "আমার প্রভুর প্রতি কি আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়?" এমনই ছিল সাধক মুহাম্মদ (সঃ)। প্রভুর আরাধনা করতে করতে প্রভুর এত সন্নিকটে তিনি পৌঁছেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র দিকে উঠেছেন এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (মুহাম্মদের) দিকে অবতরণ করেছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) এত সন্নিকট হয়েছেন যেমন দু'টি ধনুকের ছিলকা পাশাপাশি রাখলে যতটুকু ব্যবধান থাকে ততটুকু এমনকি তার চেয়েও কম" (৫৩: ৯-১০)।

আরও অনেক নবী ছিলেন যেমন মূসা (আঃ) যাঁরা আল্লাহ্‌র সামান্য নূর দেখেও অজ্ঞান না হয়ে পারেন নি (৭: ১৪৪)। কিন্তু তিনি এমনই একজন নবী ছিলেন যিনি সংজ্ঞাহারা হননি বরং দু'টি সত্তা নিকট থেকে নিকটতর হতে হতে এমন হয়েছিল যে, একেবারে একে অপরের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। তিনিই একমাত্র নবী যাঁর নিকট সবচেয়ে বেশী ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়েছে। সাধক মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি এত বড় হয়েছেন মানবতার প্রতি পূর্ণ ন্যায়-বিচার করে – তাদেরকে ত্যাগ করে নয়। সাধক মুহাম্মদ (সঃ)-এর মর্যাদা দিন দিন বর্ধিত হউক, আমীন।

বিজয়ীর আদর্শ

মক্কায় ১৩ বৎসর এবং মদীনায় ৮ বৎসর পর্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্যাতন সহ্য করলেন আঁ হযরত (সঃ)। ইসলামের শত্রুগণ তাঁকে এবং তাঁর সহচরদের প্রহার, গালি-গালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোন কিছু করতে ছাড়েনি। উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর মুসলমানদের শুইয়ে তাদের বুকের উপর পাথর চাপা দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে, মেয়েদের গুপ্ত অঙ্গে আঘাত করে তাদের মেরে ফেলতে তাদের একটু বাজেনি। মোট কথায় মানুষ যতখানি নির্দয়, নির্মম হতে পারে এবং যত প্রকার অত্যাচার হতে পারে তার সবকিছুরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তারা।

তায়েফে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং দীর্ঘ পথ পর্যন্ত শিকারী কুকুর তাঁর পিছু ধাওয়া করেছে। একদা তিনি কা'বা শরীফে নামায পড়ছিলেন। সেজদার অবস্থায় কাফেরগণ তাঁর পিঠের উপরে উটের নাড়ীভুঁড়ি রেখেছিল। কি নির্মম অত্যাচার! হযরত (সঃ)-এর এক গর্ভবতী কন্যার সাথে এরূপ খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে যে, পরিশেষে তাঁর গর্ভপাত হয়েছে এবং তিনি মারা গেছেন। এক বুড়ী হযরতের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটে তিনি কষ্ট পেতেন এবং সে কষ্ট আনন্দ চিত্তে বরণ করে নিতেন। যখন তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, কাফেররা ঘোষণা করল, যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাথা আনতে পারবে তাকে ১০০ উষ্ট্রী প্রদান করা হবে। এমনিতেই মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তারা তাঁর পিছু ধাওয়া করেছিল। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবকে রক্ষা করেছেন।

এত অত্যাচার সহ্য করার পর স্বভাবতই মানুষ সুযোগ খুঁজে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। মক্কা বিজয়ের পরে যখন তিনি দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন অনেকেই ভাবল আজ বুঝি মুহাম্মদ (সঃ) সব কিছুরই প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন। কেউ ভাবল তাদের আর রক্ষা নাই। তাদের হত্যা করা হবে। তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করলেন: "যাও তোমরা সবাই মুক্ত। আজ তোমাদের কোন ভয় নেই আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই সবচেয়ে ক্ষমাশীল।" দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম ক্ষমার নজীর আছে কি? যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন তিনি কি প্রতিশোধ নিতে পারেন? ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের অপরাধের সাথে মক্কাবাসীদের অপরাধের তফাত রয়েছে। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইগণ তাঁকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এক ভাইয়ের কারণে তারা ইউসুফ (আঃ)-কে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করে বলেছিল যে, "ইউসুফকে হত্যা কর না যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে এক গভীর কুপের তলে নিক্ষেপ কর কোন পথিক তাঁকে তুলে নিবে" (১২:১১)। মক্কাবাসী আঁ হযরত (সঃ)-কে হত্যা করার কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নি। মদীনা পর্যন্ত ধাওয়া করে কয়েকটা যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে। তিনি ঐ নারী অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দাকেও মাফ করে দিয়েছিলেন, যে হযরতের চাচা হামযা (রাঃ)-এর কলিজা চিবিয়ে রক্ত পান করেছিল। ক্ষমার এ রকম নজীর ইতিহাসের পাতায় পাওয়া দুষ্কর। এইভাবে মুহাম্মদ (সঃ) শুধু দেশই জয় করেন নি মানুষের অন্তরও জয় করে তাদের অন্তরে ইসলামের প্রেমের বীজ বপন করেছিলেন। বিজয়ী মুহাম্মদের আদর্শ সারা জাহানের মানুষের মন জয় করুক, আমীন।

স্রষ্টার প্রতি নির্ভরশীলতা

সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কখনো আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র উপরে কোন দোষারোপ করতে দেখে নি বা আল্লাহ্‌র কোন ওয়াদা পূর্ণ না হলে আল্লাহ্‌র শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখি নি। আল্লাহ্‌র শক্তির উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কয়েকটা ঘটনা থেকে তা বুঝা যাবে। তখন আঁ হযরত (সঃ)-কে হত্যা করার আদেশ জারী করা হয়েছে। একদা হুযূর (সঃ) একটি বৃক্ষের নীচে আরাম করেছিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এক কোরেশ যে সব সময় আঁ হযরতকে খোঁজ করতেছিল, সে হযরতকে এমন অবস্থায় দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আঁ হযরতকে মারার জন্য প্রস্তুত হ'ল। সে হুযূর (সঃ)-কে জাগিয়ে বললো : "হে মুহাম্মদ! এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?" আঁ হযরত স্বাভাবিকভাবেই বললেন, "আল্লাহ্।" আঁ হযরত (সঃ)-এর মুখে দৃঢ়তার সংগে উচ্চারিত "আল্লাহ্" কথাটা শুনে তার অন্তর কেঁপে উঠল। তার হাত থেকে তরবারী মাটিতে পড়ে গেল। হযরত (সঃ) তখন তাঁর হাতে তরবারী তুলে নিয়ে ঐ লোকটিকে বললেন : "এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?" লোকটি বললো, "মুহাম্মদ ছাড়া আমাকে আর কে এখন বাঁচাতে পারে।" হুযূর (সাঃ) তাকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন, সারা জগতের প্রভু আল্লাহ্‌ই একমাত্র রক্ষা করার মালিক। এর পর ঐ লোকটি হুযূর (সঃ)-এর হাতে বয়াত করে ইসলাম কবুল করল।

আঁ হযরত (সঃ) মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন। সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রাঃ)। সওর গুহায় নিয়েছেন আশ্রয়। মক্কাবাসী তাঁদের অনুসরণ করছে। এমন কি পিছু পিছু গুহার কাছে পর্যন্ত এসে গেছে তারা। কেউ বলছে মুহাম্মদ হয় এই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে না হয় আকাশে চলে গেছে। গুহার অবস্থান এমনই যে, গুহা থেকে বাইরের লোকদের দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে গুহাবাসীদের দেখতে হলে উপুড় হয়ে দেখতে হয়। এই অবস্থায় হযরত আবূবকর (রাঃ) একটু ভয় পেলেন। আঁ হযরত তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললেন, "ইন্নাল্লাহা মায়ানা" অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ্র হুকুমে মাকড়শা গুহা-মুখে একটি জাল তৈরী করেছিল। মক্কাবাসীরা ভাবলো এখানে কি প্রকারে লোক যেতে পারে। তাই তারা চলে গেল। এভাবে সামান্য মাকড়শার জাল দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে রক্ষা করলেন। মানুষ এত জ্ঞানী, এত গর্ব যার সে কিনা একটা মাকড়শার জাল ভেদ করতে পারলো না। আশ্চর্য আল্লাহ্র রহস্য!

শ্রেষ্ঠ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকারী

আগেই বলেছি: "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই বুলিটা আজকাল খুব বেশী শুনা যায়। সব মানুষ সমান। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নাই। সাদার উপার কালোর বা কালোর উপর সাদার কোন প্রভুত্ব নাই। দুনিয়ার সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্যে কায়েম হয়েছে জাতিসংঘের। কিন্তু এত ভাবনা চিন্তা, এত কিছু করার পরও মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে মানবাধিকার কি সত্যিই প্রতিষ্ঠা হয়েছে? চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানব-প্রেমে অধীর হয়ে হুযূর (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন – তোমরা এক আল্লাহ্র বান্দা। সবাই ভাই ভাই। অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। নাক কাঁটা হাবশী গোলামও যদি হুকুম দেয়ার অধিকারী হয় তবে তার হুকুম মানতে হবে। এক ভাইয়ের রক্ত অপর ভাইয়ের জন্য হারাম। শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। নিজের জীবনেও তিনি তা করে দেখিয়ে গেছেন। একটি উদাহরণ দিয়েই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করছি।

হুযূরের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসল। হুযূর একদিন সবাইকে ডেকে বললেন : "আমি তোমাদের সাথে যদি কোন অন্যায় করে থাকি তা হ'লে আজ তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে পার।" সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। একে অপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। হঠাৎ মাঝখানে একজন বলে উঠল: "হুযূর আমার কিছু বলার আছে। একদিন যুদ্ধের সারি ঠিক করার সময় আমার পিঠে আপনার কনুইয়ের গুঁতো লেগেছিল। আজ আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই।" উপস্থিত সবার তখন কি যে অবস্থা! মনে হয় লোকটাকে এখনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আঁ হযরত (সঃ) ঐ লোকটির দাবী মেনে নিলেন। ঐ লোকটি হুযূরের পিঠের কাপড় সরিয়ে পিঠের উপর চুমু খেলেন। লোকটির ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে হুযূরের পৃষ্ঠ মুবারক দর্শন করা। সারা দুনিয়ায় মানবাধিকার দানের এ রকম নজীর আর আছে কি? আসুন পাঠক, আমরা সমবেত হয়ে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়ি। আল্লাহুম্মা সল্লে 'আলা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিকা ওয়াসাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামীন।

(এই প্রবন্ধ লেখার সময় হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ) প্রণীত Ideal man পুস্তিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে)

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সংবাদ

খেলাফত দিবস পালন

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত জামাত ও সংগঠনও যথারীতি খেলাফত দিবস পালন করেছে:

ঘাটুরা, সৈয়্যদপুর, শাহবাজপুর, পটুয়াখালী, খাগদন, আহমদনগর, খালিশপুর হালকা-খুলনা জামাত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা ও রংপুর।

– আহমদী বার্তা

তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১০/০৪/৯৮ইং হতে ১৪/৪/৯৮ইং পর্যন্ত ক্রোড়ায় এবং ১৫/৪/৯৮ইং হতে ১৯/৪/৯৮ইং পর্যন্ত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ১২টি জামাতের সমন্বয়ে (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ক্রোড়া, তালশহর, ঘাটুরা, সরাইল, শালগাঁও, নাটাই, বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খড়মপুর, দেবগ্রাম ও দুর্গারামপুর) প্রায় ৩০জন খোদ্দাম ও ৭০জন আতফালের উপস্থিতিতে অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে তালীম তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসটি আয়োজনে জোনাল তরবীয়ত বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জোনাল ইনচার্জ মোস্তাক আহমদ খন্দকার বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

-বার্তা সম্পাদক

বিশেষ দোয়ার আবেদন

❑ পাক্ষিক আহমদী সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ খান বার্ধক্যজনিত কারণে খুবই অসুস্থ। তাঁর পূর্ণ রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

❑ হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ও জনাব আব্দুল হাদী সাহেবের কন্যা শওকত বেগমের এ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর অপারেশন হচ্ছে লন্ডনে। তার শীঘ্র আরোগ্য ও সুস্থতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

–সহকারী সম্পাদক

শোক সংবাদ

গত ২৬ শে মে '৯৮ বেলা ১.১০ মিনিটে আমার স্ত্রী নাসরীন আক্তার আলেয়া ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)। তিনি মৃত্যুকালে ২ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে তিনি একজন ওয়াকফে নও-এর মাতা।

আহমদী ভাইবোনদের নিকট তার রূহের মাগফেরাতের জন্য ও দুই পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজন ও খাকসারকে আল্লাহ্তাআলা যেন সবরে জামীল দান করেন সেজন্য দোয়ার অনুরোধ করছি।

– ডাঃ মোবাশ্বের আহমদ, তারুয়া

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ১৫ই মে, ১৯৯৮ইং জার্মানী]

তাশাহ্‌হুদ, আআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ বাকারার ২০৮ থেকে ২১০ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি এ জুমুআ'য় যে আয়াতগুলোর তেলাওয়াত করেছি তা জুমুআ' এবং আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা উভয়কে সামনে রেখে নির্বাচন করেছি।

আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, "মানুষের মধ্য হতে কতক এমন আছে 'মাঁইইয়াশরী নাফসাহুব্‌তিগায়া মারযাতিল্লাহি' – যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে নিজেদের আত্মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় 'ওয়াল্লাহু রউফুম্ বিল ই'বাদ'-এবং আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। 'ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুদ্ খুলু ফিস্ সিল্‌মে কাফ্‌ফা' – হে যারা ঈমান এনেছ! আত্মসমর্পণের আওতায় পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর। 'ওয়ালা তাত্‌তাবিও খুতুওয়াতিশ্ শায়তান' – এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 'ইন্নাহু লাকুম্ আদু'বুম্ মুবীন' – নিশ্চয় সে তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য শত্রু। 'ফাইন যালাল্‌তুম' – তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাদি আসার পরেও যদি তোমাদের পা টলে যায় এবং তোমরা পদস্খলিত হও, 'ফা'লামু আন্নাল্লাহা আ'যীযুন হাকীম' – তা হলে ভাল করে জেনে নাও যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী আর মহাসম্মানের অধিকারী এবং অতীব প্রজ্ঞাময়।"

এ আয়াতগুলোতে বর্ণনার ধরন প্রকাশ করছে যে, খোদাতাআলার সন্তুষ্টি প্রত্যাশীগণ সর্বদাই সেটির অপেক্ষায় থাকেন। 'মারযাত' শব্দটি বহুবচন, এটিকে কেবল 'রিযা' (এক বচনে সন্তুষ্টি) বলা যথেষ্ট নয়। যদিও অনেক সময় 'রিযা' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আমার দৃষ্টিতে 'মারযাত' শব্দটির ব্যবহার পরিষ্কারভাবে ইহা বলছে যে, প্রতি মুহূর্তে তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে, সন্তুষ্টির দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় আত্মাকে সমর্পণ করে দিয়ে থাকেন। এটা একটি বড় মহান বাক্য বা বিশেষ করে আনসারুল্লাহ্‌র জন্য এক বড় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সম্বলিত। আনসারুল্লাহ্ আল্লাহ্‌তাআলার ঐ সকল বান্দা যারা বয়সের এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যেখান থেকে কেবল খোদারই সামনে উপস্থিত হতে হবে। এর পর আর কোন ঠিকানা নেই। সুতরাং কতটুকু নিঃশ্বাস বাকী আছে, যা তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের জন্য ব্যয় করবে? যতটুকু নিঃশ্বাস ভাগ্যে জুটবে তা সবটুকুই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনভাবে ব্যয় করা উচিত যেন নিজ আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছ। এটাই সেই সময় যখন আপনি আন্তরিকতার সাথে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের উপর দৃষ্টি রাখবেন আর লক্ষ্য করবেন প্রকৃতপক্ষে আপনার জীবনের প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ্‌তাআলার রহমত এবং সন্তুষ্টির অপেক্ষায় আছে কিনা? "ইয়াশরী নাফ্‌সাহু"-এরপর নিজের তো অবশিষ্ট কিছুই থাকল না। যা কিছু রয়েছে তা যেন বিক্রি করে দিয়েছেন। বিনিময় যেন এই হয় যে, যখনই খোদার দৃষ্টি পড়ে তা যেন ভালবাসার দৃষ্টি হয়। তাঁর উদ্দেশ্যে যখন নিজ আত্মাকে বিক্রি করে দেয়া হলো তখন আর কিই-বা বাকী রইল? কোন অধিকার তো নেই। আর যদি তা না হয় তাহলে আপনি নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করেন নি। যদিও এই আয়াত সকল বয়সের বিবেকসম্পন্ন মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য তবে যেমনভাবে আমি বর্ণনা করেছি আনসারুল্লাহ্‌র সাথেই ইহা গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সময় অনেক সাহাবী ছিলেন যাঁরা এমনই করতেন যে, সর্বদা হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য অপেক্ষায় থাকতেন কখন তিনি এমন কোন কথা বলেন যা আমাদের জন্য ঈমানবর্ধক হবে অথবা এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি বলব যে, হয়ত বা তাঁদের কোন আচরণে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভালবাসার দৃষ্টি তাঁদের উপর আকৃষ্ট হবে। যেভাবে আমি হাদীস অধ্যয়ন করেছি অনেক এমন সাহাবী ছিলেন যারা বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মহববতের অন্বেষণে তাঁর সামনে বসে থাকতেন, এই উদ্দেশ্যে যে, হয়তবা এমন কোন কাজ সংঘটিত হবে যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবেন।

ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সর্বদা খোদাতাআলার ভালোবাসা অন্বেষণের অপেক্ষায় থাকেন তাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলা ভালবাসার দৃষ্টি দিয়েও থাকেন। এ শুভসংবাদটি এ বাক্যে লুক্কায়িত রয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) জানতেন যে, কারা তাঁর ভালবাসার প্রত্যাশী, আল্লাহ্‌তাআলা তো অধিক জানেন। সুতরাং যদি নিজের অবশিষ্ট জীবন এমনভাবে কাটান যাতে আপনার এ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশা থাকে যে, কখনো আমাদের নিকট থেকে এমন কাজ সংঘটিত হোক যাতে খোদাতাআলার ভালবাসার দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হয়। তাহলে স্মরণ রাখবেন এটা অসম্ভব নয়। যাদের আপন প্রতিপালক থেকে এ কামনা রয়েছে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে থাকেন। সামর্থ্য আল্লাহ্‌তাআলাই দিয়ে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার অর্থে "সিলম" অর্থাৎ শান্তির জায়গা, সেই আনুগত্যের গন্ডি, যাকে "সিলম" বলা হয়েছে অন্য অর্থে "মকামে মহব্বত সারায়েমাব" (ভালবাসার আবাস স্থল) বর্ণনা করছি। সুতরাং "ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুদ্ খুলু ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফা"– হে যারা ঈমান এনেছ! সেই

"সিলম" অর্থাৎ খোদাতাআলার ভালবাসাপূর্ণ শান্তির গন্ডিতে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ কর। কাফ্ফার দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রত্যেক প্রবেশকারী লক্ষ্য রাখবে তার আঁচলের কোন অংশ বাইরে রয়ে গেছে কি না? সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্তাআলার ভালবাসাযুক্ত শান্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা? কেননা, যদি তার কোন অংশ এ গন্ডি থেকে বাইরে রয়ে যায় তাহলে সে বিপদে আছে।

দ্বিতীয়তঃ 'কাফ্ফা'র অর্থ হচ্ছে ছোট বা বড় সকল মু'মিন সম্মিলিতভাবে প্রবেশ করা। এতে মু'মিনের একটি জামাত খোদাতাআলার ভালবাসার প্রত্যাশী হয়ে নিজের জীবন কাটাবে। এর ফল এই হবে "ওয়ালা তাত্তাবেয়ু খুতওয়াতিশ্ শায়তান" (এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না) এমন ব্যক্তি যারা এই হেফাযতের গন্ডিতে এসে যাবে তাদের জন্য সম্ভব থাকে না যে, তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যদিও "এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না" – কথাটি অতিরিক্ত মনে হয়। বাস্তবে তা উহারই ফল যে, এমন করলে তোমরা সৌভাগ্য লাভ করবে। যে খোদাতাআলার ভালবাসার গন্ডিতে বসে আছে তার জন্য কীভাবে সম্ভব যে, সে বাইরে এসে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? এ দু'টি পরস্পরবিরোধী কথা যা একত্রে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহ্) বলেছেন "ইন্নাহু লাকুম আদুবুম্ মুবীন" – স্মরণ রেখো যেখানেই তুমি তাকে সুযোগ দেবে সে তোমাকে ধোঁকায় ফেলবে, অবশ্যই সে তোমাকে ধ্বংসে নিপতিত করবে। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এই পরিষ্কার সতর্কবাণীর পর কোন মু'মিনের জন্য সম্ভবই নয় যে, সে খোদার ভালবাসার গন্ডির বাইরে গিয়ে নিঃশ্বাস নেবে। কেননা, সে জানে যখনই শয়তান সুযোগ পাবে সে তাকে ভাগিয়ে নেবে। এটির উদাহরণ এরূপ যে, যেমন মুরগীর পাখার নিচে তার বাচ্চা থাকে। বাচ্চারা বের হয়ে এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরাও করে। তবে যারা একবার আল্লাহ্র আশ্রয়ে তাঁর রহমতের ছায়াতলে এসে যায় তারা এথেকে বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু মুরগীর বাচ্চার কতক মানুষের থেকে বেশী বুদ্ধি আছে। যখন কোন বিপদ দেখে, মাথার উপর উড়ন্ত চিলের ছায়া দেখে তখন দৌড়ে গিয়ে নিজ মায়ের পাখার নিচে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই আপন নিরাপত্তা অনুভব করে। এটা সত্য যে, চিল খুবই হিংস্র – মুরগীর বাচ্চার উপর সামান্যতম দয়া দেখায় না এবং তার মোকাবেলায় মুরগীর কোন সামর্থ্যই নেই, তা সত্ত্বেও তার এ সামর্থ্য হয় না যে, সে মুরগীর পাখার ভিতর থেকে তার বাচ্চা ধরে নিয়ে যায়। আল্লাহ্তাআলা মানুষকে ঐ প্রকৃতি দান করেছেন। যখন নিজ আত্মীয় ও প্রিয়জনের ক্ষতির আশঙ্কা হয় তো মানুষ নির্ভীক হয়ে যায়, মায়েরাই সবচেয়ে বেশী নির্ভীক হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন যে, দৃশ্যতঃ দুর্বল মায়েরাও এমন অবস্থায় বেশ নির্ভীক হয়ে থাকে যেমন : বাঘিনী যখন নির্ভীক হয় তখন বড় বড় শক্তিশালী বাঘরাও ভয়ে পালিয়ে যায়। চিন্তা করুন! **একটি মুরগীর বাচ্চার যদি এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তারা যারা আল্লাহ্তাআলার ভালবাসার পাত্র তাদের কেন নিরাপত্তা বিধান হবে না? তবে ঐ মুরগীর বাচ্চা যা বাইরে থেকে যায় এবং মনে করে যে, এমন কোন অসুবিধাই নেই তাহলে অবশ্যই তাকে শিকারে পরিণত হতে হয়, চিল ছোঁ দিয়ে সেটিকে নিয়ে যায়। আপনারা মুরগীর বাচ্চা থেকে অধিকতর সতর্কতার দৃষ্টান্ত তো পেশ করুন।**

প্রথমতঃ খোদাতাআলার আশ্রয়ে এসে আপনারা প্রত্যেক শয়তানী বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন, আর অবশ্যই রক্ষা পাবেন। যদি অসতর্ক হয়ে ঐ (আল্লাহ্তাআলার আশ্রয়ের) গন্ডির বাইরে এসে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করেন তা হলে মনে রাখবেন আপনার ভাগ্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্য। যখনই আপনি এ পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন তখন ঐ পরীক্ষাই আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। সুতরাং কুরআনে করীমে "ইন্নাহু লাকুম আদুবুম্ মুবীন" – বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন, **শয়তান ওঁৎ পেতে বসে আছে। যদি তুমি তাকে সামান্যতম সুযোগ দাও তাহলে সে তোমাকে শিকারে পরিণত করে নিবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হেফাযত করা একান্ত প্রয়োজন।** তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন এসে যাওয়ার পর "ফা ইন যালালতুম" – যদি তোমরা পদস্খলিত হও, 'ফা'লামু আন্নাল্লাহা আযীযুন হাকীম" – তাহলে জেনে নাও যে, আল্লাহ্তাআলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং মহাসম্মানের অধিকারী। এটিতে আহমদীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে যে, এ যুগে তাদের নিকট এত ব্যাপক সংখ্যায় নিদর্শনাদি এসেছে যে, তাদের টলে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক আগত দিনে আল্লাহ্তাআলা আপনাদের স্বীয় তাজা নিদর্শন দেখাচ্ছেন এর পরও যদি আল্লাহ না করুন আপনাদের পদস্খলন হয় তাহলে বড়ই ব্যর্থতা হবে।

এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আমি হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদীস, অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতক উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব।

এ হাদীসটি সুনান্ আত্তিরমিযী থেকে নেয়া হয়েছে। আনাস বিন মালেক রওয়ায়াত করেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। আমি বিশেষ করে এ হাদীস এজন্যে নির্বাচন করেছি কারণ অনেকের ধারণা যে, কেবল হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-ই মসজিদে (নববী- সঃ) অবস্থান করতেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাত দিন সেখানেই থাকতেন আর বাইরে বেরই হতেন না কিন্তু (বাস্তবে) এমন অনেক সংখ্যক সাহাবা ছিলেন যারা যতটুকু সময় পেতেন তাঁরা সে সময় আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছাড়াও তাদের মধ্য হতে কতক এমন ছিলেন যাঁরা নিজেদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ বেকার, অনুপার্জনশীল ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করছেন যে, এক ভাই আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। আর অন্য ভাই (সাংসারিক) কাজে নিয়োজিত থাকতেন; সাংসারিক কাজ নিয়োজিত ভাইটি আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমার একার উপর বোঝা চাপিয়ে সে সব সময় আপনার নিকট বসে থাকে। আমি একা সংসার চালানোর দায়িত্ব বহন করে চলছি। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'লায়া'ল্লাকা তুরাযাকু বিহী' – হতে পারে তার জন্যে তোমাকে রিযক দেয়া হচ্ছে। এ হাদীসে অনেক বড় আযীমুশ্বান রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। সেটি ধর্মের সেবাকারী সকল ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য (প্রযোজ্য)। এমনিভাবে ঐ সকল জীবন উৎসর্গকারীদের জন্য যারা নিজেদেরকে খোদার সমীপে পরিপূর্ণভাবে পেশ করে দিয়েছেন। তাদের পরিবার ও আত্মীয়দের অনেকে হয়ত এটি মনে করে থাকেন যে, আমরা তাদের উপর কৃপা করছি, বোঝা বহন করছি, তাদের

বিবি-বাচ্চাদের খেয়াল রাখছি। আজ জার্মানী জামাতে সংখ্যায় অনেক এমন বৃদ্ধ, বাচ্চা, যুবক এবং মহিলারা রয়েছেন যাদের নিজের ঘরের কোন খেয়াল নেই আর যারা সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সেবায় ব্যস্ত রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্য হতে তাদের ভাই, আত্মীয়-স্বজন মনে করেন যে, আমরা তাদের সেবা করছি যেন আমরা তাদের বোঝা বহন করছি। হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ)-এর এই নির্দেশকে মনে গেঁথে নাও যে, "তোমরা কি জান যে, হতে পারে তোমাদের রিয্ক তাদের জন্যই দেয়া হচ্ছে?" যদি তারা ধর্মের সেবা করা ছেড়ে দেয় তা'হলে দেখবে তোমাদের পরিণতি কি হয়? রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ নির্দেশ যেভাবে সেই সময় সত্য ছিল তেমনি আজও সত্য। হুবহু স্বীয় পূর্ণ মর্যাদার সাথে আজকের যুগে সেবাকারীদের এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং 'ইয়াশ্‌রী নাফসাহু' – (যারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করে)-এর মধ্য তারা সবাই অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উত্তম পুরষ্কার দান করুন। তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটস্থদের হৃদয়ে যেন সামান্যতমও খেয়াল না আসে যে, তাদের জন্য তাদের পরিবারে কোন ক্ষতি হচ্ছে।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আঃ) বিভিন্ন লেখায় বিভিন্ন দিকের উপর তাকিদ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি (আঃ) বলেন, মানুষের মধ্য হতে উত্তম শ্রেণীর মানুষ সে, যে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়ে থাকে। "মাইইয়াশরি"-এর কত সুন্দর অনুবাদ! "সে উত্তম শ্রেণীর মানুষ যে খোদার সন্তুষ্টিতে উৎসর্গীত হয়ে থাকে। নিজের আত্মা বিক্রি করে দিলে, তাদের নিকট অবশিষ্ট কী রইল? তারা পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যান এবং খোদাতাআলার সত্তার স্মরণে বিলীন হয়ে থাকেন। তারা নিজের আত্মাকে বিক্রি করে খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেন। ক্রয় করে নেয়া কথাটি অত্যন্ত সুন্দর এক বাচনভঙ্গি অর্থাৎ ব্যবসায়ী যে খরচ করে ফলশ্রুতিতে তাকে সেই সওদা দেয়া হয়ে থাকে যা প্রাপ্তির জন্য সে খরচ করে। ক্রয় করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, স্বীয় সন্তুষ্টির দ্বারা তাদের লাভবান করেন। যেন তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিনে নিয়েছে। এমনিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারও এমন বিনিময় করা বাস্তব নয়, তাঁর সন্তুষ্টি ক্রয় সম্ভব নয় কিন্তু যখন তিনি নিজে বলেন, কে আছে যে আমার সন্তুষ্টি ক্রয়কারী? এমতাবস্থায় কতক লোক তার জবাবে এগিয়ে গিয়ে বলে আমরা তোমার সন্তুষ্টি ক্রয়কারী। তাহলে কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় দাবী থেকে পিছনে সরে আসবেন। তিনি অবশ্যই তাদের স্বীয় সন্তুষ্টি দান করে থাকেন। "তারা নিজের আত্মাকে বিক্রি করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেন। এরাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের উপর খোদার রহমত রয়েছে তদ্রুপ যে-ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদায় পৌঁছে যায় (সে-ও) খোদাতাআলার রাস্তায় বিলীন হয়ে যায়।" ক্রয় করা (শব্দটি) উৎসর্গ হয়ে যাওয়া থেকে পৃথক কিছু হতে পারে না। তিনি (আঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদায় পৌঁছে যায় সে খোদাতাআলার রাস্তায় বিলীন হয়ে যায়। খোদাতাআলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি যে আমার রাস্তায় আমার সন্তুষ্টির পথে আত্মাকে বিক্রি করে দেয় সে সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে চরম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সে আল্লাহ্‌তাআলার। এ চরম প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়ে যেতে হয়। আত্মাকে বিক্রি করা ক্ষণিকের ব্যবসা নয়, সমস্ত জীবনের সওদা, মৃত্যুর পূর্বে যে আত্মা বিক্রি করা হয় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা আর বিক্রয়কারীর থাকে না। সুতরাং এটা এমন কোন ব্যবসা নয় যে, হঠাৎ কোন ছাগল কারো নিকট বিক্রি করে দিয়ে যদি সামান্য ব্যথাও পায় বিদায় নিয়ে আসে। এটাতো এমন এক জীবনের সওদা যা প্রতি মুহূর্তে জীবন লাভ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। খোদার খাতিরে হাজারো মৃত্যু সহ্য করে নিতে হয়। প্রত্যেক মৃত্যুর পর তার হাজারো জীবন লাভ হয়। সুতরাং এই হচ্ছে – 'মাঁইইয়াশ্‌রী নাফসাহু' – অর্থাৎ যে, নিজ আত্মাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিক্রি করে দেয়। তিনি (আঃ) বলেন, "চরম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অবস্থার প্রমাণ দেয়।" এই নয় যে একবার বিক্রি করে দিলাম আর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল, অনেক 'ওয়াকফে জিন্দেগী' (জীবন উৎসর্গকারী) আমরা দেখেছি যারা কোন বিশেষ মুহূর্তে খোদার ভালবাসায় নিজ জীবনকে তাঁর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়ে -এরপর (এ অবস্থা থেকে) বিদায় নিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তারা সমস্ত জীবন এমন কাজ করতে থাকে যা আত্মোৎসর্গকারীগণ করেন না। আল্লাহ্‌তাআলা এদেরকে গ্রেফতার করেন আর অবশ্যই এদের মন্দ পরিণতি হয়ে থাকে। কখনও তাদের এমন অবস্থায় মৃত্যু হয় না যে,-তারা আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন। আত্মার সওদা তো প্রথম, এই সওদার সমর্থনে প্রমাণ পরে আসে যা সারা জীবনব্যাপী সরবরাহ হতে থাকে।

"এই অবস্থার প্রমাণ দেয় যে, সে আল্লাহ্‌তাআলার। নিজের সমস্ত সত্তাকে এমন একটা জিনিষ মনে করে যা সৃষ্টির অনুগত ও সেবার জন্য তৈরী করা হয়েছে"। এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জীবন উৎসর্গের ভিন্ন একটি দিক আমাদের সম্মুখে উম্মোচিত করে দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেন, **যে আল্লাহ্‌র জন্য আত্মাকে বিক্রি করে সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্যও বিক্রি করে থাকে। খোদার উদ্দেশ্য আত্মা বিক্রি সম্ভবতঃ কতকের দৃষ্টিগোচর না-ও হতে পারে কিন্তু তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে আত্মা বিক্রি করা হয় তা সবাই দেখে থাকে। সকল সৃষ্টি তার সাক্ষী হয়ে যায়। আর এ কথারও সাক্ষী হয়ে যায় যে, সে তাদের থেকে কোন লাভের প্রত্যাশায় কিছুই করে না।** কেননা, সে ফায়দা গ্রহণ করে না। তারা যখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে বলে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। আমরা কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজ করছি। তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমাদের আঘাত লাগে। আমরা তো আমাদের সওদা আল্লাহ্‌র সাথে করেছি। দাবী কেবল দাবীই থাকে না বরং তাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে এর প্রমাণ দিয়ে থাকে। তারা যখন মানবজাতির সেবা করেন তখন সমস্ত মানবজাতি সাক্ষী হয়ে যায় যে, নিজ স্বার্থে সেবা করে নি। আমাদের থেকে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যেও করে নি বরং আল্লাহ্ থেকে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেবা করেছে। দাবী কেবল দাবীই থাকে না বরং এর সমর্থনে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থিত হয়ে যায় যাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

"অতঃপর প্রকৃত পুণ্য যা সকল সামর্থ্যানুযায়ী উদ্দীপনা এবং আত্মিক ভালবাসায় সে সম্পাদন করে যেন সে নিজ আনুগত্যের আয়নায় প্রকৃত প্রেমিককে দেখছে"। আপনি যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েন তবে এ উপদেশাবলীর সূক্ষ্ম কথাগুলো বুঝতে পারবেন। যে মাথা থেকে পা

পর্যন্ত নিজের সমস্ত সত্তাকে বিক্রি করে, সে তো তার মধ্য হতে কিছুই রাখে না, যা সৃষ্টির অনুগত ও সেবার জন্য তৈরী করা হয়েছে। "অতঃপর প্রকৃত পুণ্য যা সকল সামর্থ্য অনুযায়ী" – অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে যত ক্ষমতা দান করেছেন সেই সমস্ত ক্ষমতা দ্বারা সে আল্লাহ্‌র ধর্ম এবং তাঁর সৃষ্টির সেবা করে। প্রত্যেকের পারদর্শিতা ও যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন। তবে যার সামর্থ্যে যা রয়েছে তাই তো সে বিক্রি করে। সুতরাং একজন ধনী ব্যক্তি যেভাবে তার সমস্ত সত্তা বিক্রয়কারী হয় তদ্রূপ একজন দরিদ্র ব্যক্তিও তার সত্তার বিক্রয়কারী হয়ে থাকে। সামর্থ্যতো তার নিজের তৈরী করা নয়, সামর্থ্য তো আল্লাহ্ দান করে থাকেন। সুতরাং "মিম্‌মা রাযাকনাহুম ইউনফিকূন" – এর অর্থ হচ্ছে যা সে বিক্রি করে তা-তাই যা আমরা তাকে দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্য হতে নিজের জন্য কিছুই রাখে না, সমস্তই পেশ করে দেয়। কারো ভাগ্য যদি অত্যন্ত নগণ্য হয় অর্থাৎ কোন কিছুই না থাকে তাহলে দৃশ্যতঃ নিজের শূন্য আঁচলে খোদা লাভের পূর্ণ বাসনা এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসাসহ খোদার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সে-ও এমন ব্যক্তি, যে সব কিছু বিক্রি করে থাকে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "এমন ব্যক্তি উদ্দীপনা ও আত্মিক ভালবাসায় তা সম্পাদন করে" – আমি যে বলেছিলাম কামনা ও ভালবাসা নিয়ে উপস্থিত হয়-এটি "হুযূরে দিলসে বাজালাতা হ্যায়" (আত্মিক ভালবাসায় সম্পাদন করে)-এর অনুবাদ। তার হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, যে পর্যন্ত সেবা সম্ভব তা আমি করব। "যেন সে নিজের আনুগত্যের আয়নায় নিজের প্রকৃত প্রেমিককে দেখছে" – তার আনুগত্যের একটি আয়না তার সম্মুখে রয়েছে তাতে সে তার নিজ সত্তাকে দেখতে পায় না, সেই প্রেমিককে দেখতে পায় যার জন্য সে নিজের সমস্ত জীবনকে একটি নতুন আঙ্গিকে সাজায়।

"তার পরিকল্পনা খোদাতাআলার পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে।" যা আল্লাহ্‌তাআলার পরিকল্পনা তাই তার পরিকল্পনা, যা প্রভুর পরিকল্পনা তাই গোলামের পরিকল্পনা। "এবং তার সমস্ত আনন্দ আনুগত্যে অবস্থান নেয়।" ঠেহের জাতি হ্যায় (অবস্থান নেয়) – শব্দটি চিন্তার বিষয়। তিনি (আঃ) বলেন, সে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিতে এমন স্বাদ লাভ করে না যা ক্ষণস্থায়ী। সেই স্বাদ তার হৃদয়ে অবস্থান নিয়ে থাকে। সেই স্বাদ এমনভাবে অবস্থান নেয় যে, যাওয়ার নামই নেয় না। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তি যারা কখনো আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিতে স্বাদ পান আবার কখনো স্বাদ পান না তারা ভিন্ন শ্রেণীর।

সংখ্যায় অনেক এমন ব্যক্তি আছেন যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে কখনো কখনো অবশ্যই স্বাদ পাচ্ছেন। তবে তারা নিজেদের আত্মা বিক্রি করেন নি। এ জন্য সেই ভালবাসা এসে অবস্থান নেয় না। আসে আর চলে যায়। তাই অন্য স্বাদগুলো হৃদয়ে নিজের বাসা তৈরী করে নেয়। এমনভাবে খোদার (রাস্তায়) আত্মা বিক্রয়কারী বান্দারা সাধারণ বান্দাদের থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে পৃথক হন। এটি একটি গভীর সত্যতা যার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ সত্যতা বর্ণনা করে আমাদের চক্ষু থেকে আবরণ দূর করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে সংখ্যায় অনেক এমন আছেন যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ফলে কখনো কখনো হৃদয়কে স্বাদে তৃপ্ত হতে দেখেছেন। অনেকে এমন আছেন যারা খোদার কোন বিশেষ পুরস্কারের চিন্তা করে অথবা আল্লাহ্‌তাআলা তাদের কোন বিশেষ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন তা ভেবে তাদের শরীর শিউরে উঠে। প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা একটি স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। তবে অবস্থান নেয় না – আসে আর চলে যায়। এর পর পৃথিবীর স্বাদসমূহ হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এক একটি শব্দে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। "তার সমস্ত আনন্দ আনুগত্যে অবস্থান নেয়"– পৃথিবীর নাম করা সাহিত্যিকও এমন লেখা লিখতে পারবে না যার প্রতিটি শব্দ অর্থবহ হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাগ্মিতা এবং বাকপটুত্ব সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কোন একটি শব্দ নেই যা সত্যতার আলোয় উদ্ভাসিত নয়। এই সত্যতাই তাঁর লেখায় সব সময়ের জন্য জীবিত করে রাখছে।

"সমস্ত সত্যকর্ম পরিশ্রমের মাধ্যমে নয় বরং স্বাদ ও তৃপ্তির মোহে সম্পাদিত হতে আরম্ভ করে।" হৃদয়ে যখন খোদাতাআলার ভালবাসার স্বাদ অবস্থান নেয় তখন সেটিকে বৃদ্ধি করা এবং সর্বদা পাথেয় বানানোর চেষ্টা করা – এমন স্বাদের জন্য যখন মানুষ চেষ্টা করে তখন সেটি পরিশ্রম হয় না। আমাদের সকল ইবাদত এবং খেদমত যা পরিশ্রমের দ্বারা সম্পাদিত হয় সেগুলো স্বাদহীন কোন বিষয় যাতে স্বাদ সাথে সাথে পাওয়া যায় সেটিকে পরিশ্রম বলা যায় না। পৃথিবীতে ছোট ও নগণ্য দোকানদারদের দেখুন! নিজের অল্প পয়সা উপার্জনের জন্য কতইনা পরিশ্রম করছে! যেহেতু ঐ পয়সায় স্বাদ পাচ্ছে এ জন্য যদিও দর্শক মনে করে যে, বড় পরিশ্রম হচ্ছে, বাস্তবে তারা এটাকে কোন পরিশ্রম মনে করে না। চিন্তা করুন! কোন দোকানদার বা শস্য ব্যবসায়ী যে সকালে উঠে দোকান খুলে, রাতের ১২টা পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ করতে থাকে। আপনি যদি দুপুর বেলায় তার নিকট গিয়ে সহানুভূতি করে বলেন, ভাই অনেক হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ এখন দুপুর, কিছু আরাম করে নাও। তাহলে সে আপনাকে কেমন কটু দৃষ্টিতে দেখবে? (বলবে) যাও আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও আমি এতে স্বাদ পাচ্ছি। স্বাদ ব্যতিরেকে সে ঐ কাজ করতেই পারে না। সুতরাং তিনি (আঃ) বলেন, "সমস্ত সৎকর্ম পরিশ্রমের মাধ্যমে নয় বরং স্বাদ ও তৃপ্তির মোহে সম্পাদিত হতে আরম্ভ করে। সমস্ত সৎকর্মে তাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্বাদ অনুভূত হয়। এ জন্য আপনা-আপনিই সম্পাদিত হতে থাকে। এটি নগদ বেহেশ্‌ত – এটি চিন্তার বিষয়। নগদ বিনিময়। এটি মনে করো না যে, এ পৃথিবীতে তো বেহেশ্‌ত মেলেনি তবে পরকালে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ ঋণ রাখেন না। সেই বেহেশ্‌ত যা খোদাতাআলার ভালোবাসা সম্বলিত উত্তম স্বাদসমূহের বেহেশ্‌ত সেটি তোমরা এ পৃথিবীতে হাতে নাতে পাবে। এটিই সেই নগদ বেহেশ্‌তে যা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি লাভ করে থাকে। সেই বেহেশ্‌তে যা ভবিষ্যতে লাভ হবে তারই এটি চিহ্ন ও প্রতিচ্ছবি। এ পৃথিবীতে যারা ঐ বেহেশ্‌ত লাভ করেছে তা তারই প্রতিচ্ছবি যা পরকালে লাভ করবে। তার চিহ্ন অর্থাৎ যেন তার ছায়া যেমন মানুষ তার পায়ের চিহ্ন ছেড়ে যায়। সেখানে পা তো নেই কিন্তু পদচিহ্ন মূল পায়ের রাস্তা প্রদর্শনকারী হয়। পরকালে যে বেহেশ্‌তে লাভ হবে তা ঐ বেহেশ্‌ত নয় যা ঐ পৃথিবীতে পেয়ে গেছে এর চেয়ে অনেক উন্নত হবে। এই পৃথিবীতে যার ভাগ্যে আল্লাহ্‌তাআলার

ভালোবাসার স্বাদ সম্বলিত বেহেশ্‌ত আর নগদ বিনিময় লাভ হয়, সেই পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারে যে, যখনই আমি মৃত্যুবরণ করব তখনই এই বেহেশতের ছায়ানুরূপ অধিক উত্তম জিনিস আমার লাভ হবে যার কল্পনাই আমি করতে পারি না।

হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ)-এর পর পৃথিবীতে যত ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান বর্ণনাকারী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের মধ্য হতে কারো এমন লেখা বের করে দেখাও। এই দুর্ভাগা মৌলবীগণ কেন নিজেদের পরিণামকে নষ্ট করছে। এমন এক তত্ত্ব-জ্ঞানীর বিরুদ্ধে লেগে, তাঁর সম্পর্কে নোংরা কথা বলে, যিনি আমাদের জন্য আল্লাহতাআলার ভালবাসার রাস্তাকে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করে যাচ্ছেন।

তিনি (আঃ) বলেন, "যাকে পরজগতে খোদার কুদরত বাহ্যিকভাবে 'মুতামাস্মেল' (উপমা) দিয়ে দেখানো হয়েছে।" 'আসার' (চিহ্ন) এবং 'আযলাল' (প্রতিচ্ছবি) বাহ্যিকভাবে 'মুতামাস্মেল' (উপমা) হতে পারে না। কোন জিনিসের যদি ছায়া হয় তাহলে তা ছায়াই হবে মূল তো হতে পারবে না। তিনি (আঃ) বলেন, "ইহা ঐ ছায়া নয় (বরং পরকালে) খোদাতাআলার পূর্ণ কুদরত ঐ পৃথিবীর জান্নাতকে উপমা দিয়ে বুঝাবেন।" বাস্তবে দেখা, অনুভব করা, সুগন্ধে ভরপুর ও স্বাদে পূর্ণ জান্নাত প্রকৃত জান্নাতে রূপ নিবে। সেই যে বাস্তবতা তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কেননা, কুরআন করীম বলছে যে, কোন চক্ষু এমন নেই যে, সেই জান্নাতকে দেখেছে, কোন কান এমন নেই যে, ঐ জান্নাতের বর্ণনা শুনেছে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে যা কিছু আছে খোদাতাআলাই ভাল জানেন। এ পৃথিবীতে খোদাতাআলার ভালবাসার যে আনন্দ রয়েছে তা এত বেশী যার প্রত্যাশায় মানুষ সমস্ত পৃথিবীকে একদিকে ঠেলে দিয়ে সেগুলোকে গ্রহণ করে। সেই আনন্দের আধিক্যের কারণে অন্য সকল স্বাদ হেয় প্রতিপন্ন হয়। এই স্বাদের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশী স্বাদ ভবিষ্যতে নির্ধারিত রয়েছে। তার ধারণা যদি করা যায় তা হলে অন্যকিছু না হোক সেই স্বাদের জন্য নিজের পৃথিবীকে পরিবর্তন কর। যদি এ দুনিয়াতে জান্নাত লাভ না হয়, তাহলে সেই সমস্ত স্বাদের জন্য যা কিছু করবে সবই বৃথা যাবে। এই পয়গামটি ভালভাবে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। সাধারণতঃ কতক মানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দৃশ্যতঃ পরকাল লাভের চেষ্টা করে থাকে। কতক এরূপ পরিশ্রমকারী আছে যাদের দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা শুকিয়ে যায়। হাত উঁচা করে তো হাত অবশ হয়ে যায়। পরিণামে কিছুই লাভ হয় না। কেননা, মৃত্যুর পরবর্তী যে জীবন আছে তা তাদেরই লাভ হয় যারা এই বিষয়সমূহে প্রকৃত স্বাদ পেয়ে থাকে। যে এক আনন্দ লাভের খেয়ালে নিজেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে সে পেতে পারে না *(রিপোর্ট জলসায়ে আযম- এর ১৩১-৩২ পৃষ্ঠা থেকে ঐ উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে)*।

এই রিপোর্ট থেকেই আর একটি উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সামনে রাখছি। তিনি (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলার প্রিয় বান্দা খোদার রাস্তায় নিজ আত্মা উৎসর্গ করে থাকেন। এর বিনিময়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়। তারাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা খোদাতাআলার বিশেষ রহমতের অধিকারী। বস্তুতঃ সেই ইস্তেকামাত (দৃঢ়চিত্ততা) যার মাধ্যমে খোদা লাভ হয় তার মূলতত্ত্ব উহাই যা বর্ণনা করা হয়েছে। যার বুঝার ইচ্ছা আছে সে বুঝে নিক" *(রিপোর্ট জলসায়ে আযম মাযাহেব পৃষ্ঠা-১৮৮)*।

আমি এখন ইস্তেকামত সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতক উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে রাখছি। সময় যেহেতু অল্প অবশিষ্ট আছে এজন্য দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

আল্ হাকাম ৪র্থ খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা ১৬ই আগস্ট ১৯০০ ইং-এর সংখ্যায় এই লেখাটি এসেছে। "আল্লাহ্‌র বান্দা যারা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। তিনি তাদের দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করে থাকেন। যেমন তিনি নিজে বলেছেন 'ওয়াল্লাহু রউফুম বিল ইবাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বান্দাদের উপর অত্যন্ত মমতাশীল। তারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনকে তাঁরই রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়। নিজ আত্মাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবান করা, নিজ সম্পদকে তার রাস্তায় খরচ করা-খোদার ফযল এবং নিজের সৌভাগ্য মনে করে।" সুতরাং বিশ্বের সকল জামাত যারা কুরবানীর এই অসাধারণ যুগে প্রবেশ করেছে, এ জামাতসমূহের মধ্যে খোদাতাআলা জার্মানী জামাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তাদের সকলের জন্য এ লেখার মধ্যে একটি শিক্ষা রয়েছে। তারা যতই কুরবানী করুক সেটিকে যেন আল্লাহ্‌র দয়ার একটি অংশ মনে করেন, কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করেন যে, খোদা তাদের এ সামর্থ্য দিচ্ছেন। ভুলেও যেন এ ধারণা না জন্মে যে, আমরা খোদার জন্য কিছু করছি। খোদার জন্য হোক বা খোদার উদ্দেশ্যে মানবজাতির জন্য উভয় অবস্থায়ই খেদমত নিজের জায়গায় সৌভাগ্য। এটিকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নগদ বিনিময় হিসাবে উল্লেখ করছেন। প্রত্যেক খেদমত নিজ সত্তায় নিজের প্রতিদান। প্রতিদানের ক্ষেত্রে মানুষ কারো প্রতি কৃপা দেখায় না। যে তাৎক্ষণিক প্রতিদান পেয়ে থাকে সে কীভাবে কারো উপর কৃপা দেখাতে পারে? "নিজের আত্মা এবং সম্পদকে এ রাস্তায় খরচ করা-আল্লাহ্‌র ফযল এবং নিজের সৌভাগ্য মনে করে। তবে যারা পৃথিবীর ধন-দৌলতকে নিজের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় তারা একটি কল্পনার দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখে থাকে।" "পৃথিবীর ধন-দৌলতকে নিজের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে দেয়।"-দুনিয়া অর্জনের ব্যাপারে আপত্তি সম্ভব নয়। অন্য কিছুর জন্য না হলেও মানুষ খোদার রাস্তায় খরচ ও মানবজাতির সেবার জন্য দুনিয়ায় উপার্জন করবে। যার নিয়্যত এই হয় যে, আমি এতটুকু লাভ করি যদ্বারা বেশি বেশি আল্লাহ্, তার ধর্ম এবং বান্দাদের সেবা করতে পারব। এমন ব্যক্তি এ দুনিয়ার অর্জনকে আসল উদ্দেশ্য মনে করে না। অর্থাৎ যদি উপার্জন থাকে তাহলেও ঠিক আছে আর যদি না থাকে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি থাকে তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এমন ব্যক্তি থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে এই পরীক্ষায়ও পরীক্ষা করতে পারেন যখন তাদের থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়। তখন তাদের চেহারায় বিষণ্নতা এবং হৃদয়ে বিমর্ষতা আসে কি? যারা আল্লাহ্‌তাআলার জন্য বিলীন হয়ে থাকে তারা নিজেদের নিকট যা কিছু আছে তাই তাঁর রাস্তায় কুরবান করতে থাকেন। তারা বেশি কুরবানী তো উপস্থাপন করতে পারবেন না তবে যা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে তাই তারা করতে থাকবেন। এর বিপরীতে কতক এমন রয়েছেন যাদের খোদাতাআলা ভাল অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা নেন তখন কিছু না কিছু খোদাতাআলার রাস্তায় খরচ করে থাকেন। তবে যখন তাদের অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা

আসে তখন তারা অনুমতি নেয় যে, এখন আমাদের আর সামর্থ্য নেই। অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বিষয় বর্ণনা করেছেন সেই অনুযায়ী "দুনিয়া অর্জন আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর দেয়া থেকে তার রাস্তায় খরচ করা", সুতরাং **যদি তিনি অল্প দিয়ে থাকেন তবে সেই অল্প থেকে দাও আর যদি বেশি দিয়ে থাকেন তবে সেই বেশি থেকে দাও। এরাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের ধর্ম দুনিয়ার উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।** তিনি (আঃ) বলেন, "এমন ব্যক্তিগণ ধর্মকে একটি কল্পিত কাহিনী মনে করে। প্রত্যেক মানুষ এই কল্পনার দৃষ্টিকে চিনে থাকে। কমপক্ষে মানুষের মধ্যে নিজের কল্পনার দৃষ্টিতে চেনার যোগ্যতা রয়েছে। তার আশে পাশে যত ধর্মীয় কর্মসমূহ সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোকে হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রবাহমান ঘটনা মনে করে। তার হৃদয় সরাসরি সে ঘটনাগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আহমদীয়ত উন্নতি করছে, মানুষ পুণ্যবান হচ্ছে, সবার মধ্যে কুরবানীর আত্মা জাগরিত হচ্ছে তাদের অনুভব হয় না যে, সব আমাদের জন্য খোদাতাআলার পুরস্কার। ধর্মীয় উন্নতি সম্পর্কিত প্রত্যেক সেই কথা যা আমি শুনে থাকি তা আমার হৃদয়ে ব্যাপক আনন্দের সৃষ্টি করে। সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র), বিসমিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নামে) তো বলে থাকে কিন্তু সরাসরি হৃদয়ে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয় না যেমন নিজের ব্যবসার উন্নতিতে তাদের হৃদয়ে একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি কেউ তাদেরকে এই সংবাদ দেয় যে, তুমি অমুক জায়গায় যে টাকা ব্যবসায় ব্যয় করেছিলে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীতে এমন দৈব ঘটনা হয়ে থাকে যার কারণে মানুষের সাধারণ ব্যবসাও অনেক উন্নতি করে থাকে। যদি তারা এমন দেখে তাহলে কখনো তাদের হৃদয় এই বিষয়টিকে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখবে না। তাদের হৃদয় অত্যধিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আর তা হৃদয়ে জায়গা নিবে না। এই সংবাদ এত গভীর দাগ কাটবে যে, যদি এটিকে আহমদীয়তের সফলতার সংবাদের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে সেটি (আহমদীয়তের সফলতার স্মরণ) কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এগুলো অনেক সূক্ষ্ম কথা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কয়েক শব্দে বর্ণনা করছেন। এমতাবস্থায় আমি যখন বুঝিয়ে দিয়েছি পুনরায় এই লেখাটি শুনলে বুঝতে পারবেন কল্পনার দৃষ্টি কী অর্থ বহন করে। "তবে যারা পৃথিবীর ধন-দৌলতকে মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়; তারা ধর্মকে একটি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কিন্তু সত্যিকার মু'মিন এবং সত্যবাদী মুসলমানের এ কাজ নয়। প্রকৃত ধর্ম এটিই, যে নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্যকে মৃত্যু পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়। যতক্ষণ জীবন রয়েছে এই সমস্ত জিনিসকে উৎসর্গ করে দাও। এতে করে যেন তারা পবিত্র জীবনের অধিকারী হয়ে যায়।" যাদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে তারা পবিত্র জীবনপ্রাপ্ত। এরাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে খোদাতাআলার জন্য উৎসর্গ করে।

অতঃপর "ইয়াদ্‌দাশতে বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ড পৃষ্ঠা ২১ এবং পয়গামে সুলাহ্ পৃঃ-৪৮" থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে। "হে ঈমান আনয়নকারীগণ! খোদাতাআলার রাস্তায় নিজেদের গর্দান পেতে দাও আর শয়তানের রাস্তা অবলম্বন করো না।" যেভাবে আমি আল্লাহ্‌র কালাম থেকে একথা প্রমাণ দেখিয়েছিলাম "আওর" (আর) শব্দটি দৃশ্যতঃ একটি অতিরিক্ত কথার দাবী করে কিন্তু বাস্তবে তা প্রথম কথাটিরই ব্যাখ্যা। ঠিক এই অর্থেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিটি "হে ঈমান আনয়নকারীগণ! খোদাতাআলার রাস্তায় নিজের গর্দান পেতে দাও।" গর্দান দু'ভাবে পেতে দেয়া যায় একটি হচ্ছে ঐ বলদ যার কাঁধে খেদমতের জোয়াল লাগানো হয়। সেই বলদ যার অভ্যাস হয়ে গেছে কৃষক যখন জোয়াল নিয়ে তার কাঁধে পরানোর জন্য তার দিকে অগ্রসর হয় তখন আমি নিজে এমন বলদকে মাথা নিচু করে দিতে দেখেছি। এমন বলদকে কৃষক অনেক ভালবাসে। এছাড়া কিছু বলদ এমন আছে যে, গুঁতো মারে। এদের বড় কষ্টে কাবু করতে হয়। রশির ফাঁদ এদের শিং-এ পরাতে হয়। এক ব্যক্তি একদিকে টেনে ধরে রাখে অন্য ব্যক্তি আগে বেড়ে জোয়াল পরিয়ে দেয়। সুতরাং **এমন ব্যবহার নিজের আল্লাহ্‌র সাথে কর না। তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাজ হয়ে, তাঁর জন্য আত্মাকে বিক্রি করে দিয়ে জোয়াল পরার জন্য নিজের কাঁধ পেতে দাও।** হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, খোদাতাআলার রাস্তায় নিজের গর্দান পেতে দাও'–এই হচ্ছে একটি অর্থ। অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, যবাই হওয়ার জন্য মাথা পেতে দাও। যেমনভাবে হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজের গর্দান পেতে দিয়েছিলেন। এ দু'টি পদ্ধতিই এমন যা দিয়ে আপনি নিজের আত্মার মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, আমি এ আত্মা বিক্রি করে দিয়েছি এখন আমার আর কোন অধিকার নেই। এর পর (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই বলা যে) "শয়তানের রাস্তা অবলম্বন কর না" এ অর্থ হতেই পারে না যে, এমন গর্দান পেশকারী সন্দেহজনকভাবে শয়তানের রাস্তা অবলম্বন করবে। এর অর্থ হচ্ছে, এ কথাটি এবং ঐ কথাটি ভিন্ন ভিন্ন। শয়তানের রাস্তা অবলম্বনকারী ভিন্ন মানুষ আর এরা (খোদার রাস্তায় গর্দান পেশকারী) সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। **যদি শয়তান থেকে বাঁচতে চাও তাহলে খোদার সম্মুখে গর্দান পেশ করা আবশ্যক, শয়তান তোমাদের শত্রু।** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যা বর্ণনা করেছেন তা ঐ আয়াতে করীমেরই ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ যা আমি পূর্বে তেলাওয়াত করেছিলাম। তিনি (আঃ) বলছেন, "এ জায়গায় শয়তানের অর্থ হচ্ছে যারা মন্দের শিক্ষা দেয়।" এ সন্দেহ যেন না জন্মে যে, কোন কাল্পনিক শয়তান যার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এটি থেকে বেঁচে আছি। তার আশে পাশে এ গন্ডির মধ্যে মন্দকর্মের দিকে আহ্বানকারীগণই শয়তান। সুতরাং যে নিজের গর্দান খোদাতাআলার সম্মুখে পেশ করে রেখেছে, সে কি তাদের কথা কখনও শুনতে পারে? সে তাদের ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিবে। এমন ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব সে কল্পনাই করতে পারে না। সবকিছু খোদার সমীপে সোপর্দ করে কীভাবে তা থেকে অংশ চাইবে? এমন ব্যক্তির ব্যাপারেই আমাদেরকে 'আউযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বনির্ রাজীম' এর বাক্য শিখানো হয়েছে যে, তেলাওয়াতের পূর্বে অবশ্যই পড়ে নিও। কেননা, যখন তেলাওয়াত কর তখন যেন খোদাতাআলার হয়ে যাও। আর শয়তান চেষ্টা করবে তোমাদের কোন না কোন অংশ খোদার ফযল থেকে বাইরে থেকে যায়। আর সে সেটিকে কেড়ে নিবে। সুতরাং তারাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা জীবিত অবস্থায় আপনাদের আশে পাশে ঘোরা-ফেরা করছে। আপনি তাদের জানেন, দেখছেন এবং সম্পর্কও রাখছেন, যারা খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছে। (তারা) বলে যে, এ মিথ্যা বল তাহলে এই লাভ হবে। এমন জায়গা যেখানে পয়সা লাগানো হারাম – বলে যে, এখানে পয়সা লাগাও তাহলে লাভ হবে আর এভাবে অর্থ উপার্জন কর। এগুলো

কোন কাল্পনিক কথা নয় প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়া বাস্তবতা। আপনি এগুলোকে দেখছেন কিন্তু চিনতে পারছেন না। সুতরাং যে খোদার রাস্তায় নিজের গর্দান দিয়েছে সে অবশ্যই চিনবে। এই আয়নায় **নিজেকে দেখুন এবং নিজেই নিজের বিচার করুন**। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে খোদার সম্মুখে পেশ করে দেয়।" এখানে গর্দান শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এগুলোতে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। "যে নিজের সত্তাকে খোদার সম্মুখে পেশ করে দেয়।" তার মাথা থেকে পায়ের নখের কোণা পর্যন্ত কিছুই নিজের অবশিষ্ট রইল না।

"নিজের জীবন তাঁর রাস্তায় উৎসর্গ করে পুণ্য করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট হয়। সুতরাং সে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ঝর্ণা থেকে তার প্রতিদান পাবে।" এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ঝর্ণা থেকে পান করানো হবে। আমরা যাকে কাওসার বলি এটি সেই কাওসার, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ঝর্ণা। যার ভাগ্যে এ ঝর্ণা জুটে সে যেন জীবন দানকারী পানি পেয়ে যায়। এমন ব্যক্তির উপর কখনো মৃত্যু আসে না। অতএব তাদের কোন ভয় বা দুঃখের কারণ নেই। তাদের থেকে মৃত্যু উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সর্বদা জীবিত রাখার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এমন ব্যক্তিদের কোন ভয় এবং দুঃখের কারণ নেই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে খোদার রাস্তায় ব্যয় করে শুধু খোদারই জন্য তার কথা, কর্ম, চলা-ফেরা এবং সমস্ত জীবন হয়ে যায়। সত্যিকার পুণ্য করার জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। খোদা নিজ পক্ষ থেকে তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ভয় এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দিবেন। স্মরণ রেখো, এই 'ইসলাম' শব্দটি যা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা কুরআন শরীফ অন্য শব্দে 'ইস্তেকামত' বলে উল্লেখ করেছে।" আমি বলেছিলাম পূর্বে যে ইস্তেকামত শব্দ এসেছে সেটির ব্যাখা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)- এর বাক্যেই আপনাদের সম্মুখে পেশ করব।

এ উদ্ধৃতির পর আমি খুতবা জুমুআ'টিকে শেষ করব। তিনি (আঃ) বলেন, "অন্য শব্দে কুরআন করীম এর নাম 'ইস্তেকামত' রেখেছে যেমনভাবে তিনি (আল্লাহ্) এ দোয়া শিখিয়েছেন– "ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাক্বীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলায়হিম' অর্থাৎ আমাদেরকে 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত কর। ঐ ব্যক্তিদের রাস্তায় যারা তোমার থেকে পুরস্কার পেয়েছে। ঐ ব্যক্তিদের রাস্তা 'ইস্তেকামত' -এর রাস্তা ছিল যাঁরা নবী ছিলেন। ঐ ব্যক্তিদের রাস্তা 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তা ছিল যাঁরা সিদ্দীক ছিলেন। তাঁরা পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে তাদের নবীদের পিছনে চলেছিলেন ঐ ব্যক্তিদের রাস্তা 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তা ছিল যাঁরা এ রাস্তা থেকে না পিছিয়ে এই রাস্তাতেই নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছেন। ঐ সালেহীনগণও 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তায় ছিলেন যাঁরা এই কাফেলার পিছনে পিছনে আসছিলেন। তাঁরাও এই কাফেলারই অংশ ছিলেন। তাঁরা সম্মুখে তো অগ্রসর হতে পারেন নি কিন্তু পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই রাস্তায়ই নিজেদের জীবন সমাপ্ত করেছেন। তিনি (আঃ) বলেন, এটি হচ্ছে 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তা। দোয়ার অনুবাদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শব্দে এই "আমাদেরকে 'ইস্তেকামত'-এর রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কর। ঐ ব্যক্তিদের রাস্তায় যাঁরা তোমার থেকে পুরস্কার পেয়েছে এবং যাঁদের জন্য ঐশী দরজা খুলেছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়ে 'ইস্তেকামত'-এর বিচার সেটির অন্তর্নিহিত অবস্থার উপর বিবেচনা করে করা হয়।"এ বাক্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় যা আপনাদের বুঝিয়ে না দিলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন না। "প্রত্যেক বিষয়ের 'ইস্তেকামত'-এর বিচার সেটির অন্তর্নিহিত অবস্থার ওপর বিবেচনা করে করা হয়।" ইস্তেকামত'-এর জন্য প্রথমে এটি জানা প্রয়োজন যে, এ বিষয়টির উদ্দেশ্য কী ছিল? একে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ছিল? ঐটির ইস্তেকামত তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বের করা হবে। অর্থাৎ সেটির ইস্তেকামত'-এর বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী তৈরি হওয়া আবশ্যক। 'মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতিকে খোদাতাআলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের ইস্তেকামত-এর পরিমাণ হচ্ছে, যেমনভাবে তাকে দাসত্ব অবলম্বন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনই বাস্তবেও সে যেন খোদার হয়ে যায়। **সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল এই, সে যেন সব সময় খোদাতাআলার ইবাদত করে, সব সময় তার অনুগত থাকে। যদি এ উদ্দেশ্য সফল হয় তাহলে এটি হবে তার 'ইস্তেকামত'। কেবল রাস্তার দুঃখগুলো সহ্য করার নাম 'ইস্তেকামত' নয়।** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যাখ্যা আমাদেরকে বলছে যে, আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ইবাদত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের 'ইস্তেকামত'-এর অর্থ হবে যে, আমাদের সমস্ত সত্তা ইবাদতের জন্যই নিবেদিত হয়ে যায়, সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। "যখন সে সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে তখন নিঃসন্দেহে তার উপর পুরস্কার বর্ষিত হবে। যাকে অন্য অর্থে পবিত্র জীবন বলা যেতে পারে।" 'সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলায়হিম'-এর মধ্যে আন্‌আমতা আলায়হিম-এর অনুবাদ হচ্ছে অবশ্যই তার উপর পুরস্কার নাযেল হবে।'এনআম'-এর সাধারণ অর্থ এই করা হয়ে থাকে যে, তার বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার লাভ হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এটির এ অর্থ করেন নি (বরং বলছেন) "যাকে অন্য শব্দে পবিত্র জীবন বলা যেতে পারে।" 'এনআম'-এর অর্থই হচ্ছে পবিত্র জীবন। যখন খোদাতাআলার পক্ষ থেকে পবিত্র জীবন লাভ হয়ে যায় তখন বিশ্বাস রাখুন যে, এটি পুরস্কার। যদি পবিত্র জীবন লাভ না হয় আর কেবল জাগতিক কল্যাণ লাভ হয় তাহলে এই ধোঁকায় নিপতিত থাকবেন না যে, এটি আল্লাহ্‌তাআলার 'এনআম', যা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আপনি 'সিরাতাল্ মুস্‌তাক্বীম' এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। **সুতরাং পবিত্র জীবন হচ্ছে আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমরা সবাই যদি সেই পবিত্র জীবন লাভ করে নেই তাহলে এটিই হবে জীবনের উদ্দেশ্য যা আমরা লাভ করে নিয়েছি। অতঃপর আমরা এই বলে আত্মাকে আত্মার মালিককে সোপর্দ করতে পারব** যে, 'ফুযতু বিরাব্বিল কা'বাতে' আমি কা'বার প্রতিপালকের কসম খেয়ে বলছি যে, আমি সফলকাম হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের এ সফলতা দান করুন, আমীন।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ–মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী

"সত্যিকারের ঈমান পুণ্য কাজের বীজস্বরূপ"।

"উত্তম ফলের (বীজ) দ্বারা অবশ্য উত্তম ফলই হয়ে থাকে"। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)]

মহানবী (সঃ)-এর মহাজীবনের এক টুকরো

আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের প্রতি আলোকপাত করিতে যাইতেছি যিনি নিঃস্ব এতীম হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরিণামে পৃথিবীর জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে যাঁহার জীবনাবসান হয়। মানবীয় গুণাবলীর চরমতম প্রকাশ যাহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। যিনি আল্ কুরআনের জীবন্ত ও বাস্তব আলেখ্য, জগদ্বাসীর জন্য চরম ও পরমতম আদর্শ এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত যাঁহার জীবনী আলোচিত ও অনুসৃত হইতে থাকিবে, আমার আজিকার আলোচনা সেই জীবনীর সহস্রতম অংশের অপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ লইয়া।

তিনি একাধারে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জগতের বাদশাহ্। জীবন চক্রে চলার মাঝে এক পর্যায়ে তিনি সারা আরবের বাদশাহাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, তাঁহার কোন প্রাসাদ ছিল না। নিয়মিত কোন সৈনবাহিনী ছিল না, কোন দেহরক্ষীও ছিল না। তাঁহার কোন রাজকর আদায়ের ব্যবস্থাপনাও ছিল না। তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন অথচ ক্ষমতা প্রয়োগের কোন উপকরণ ছিল না তাঁহার। তাঁহার দ্বারা জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইল কিন্তু তাঁহার ব্যক্তি জীবনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। ব্যক্তি-জীবনে তিনি ছিলেন বরাবরই নিঃস্ব ও দরিদ্র। রুজি-রোজগারের কোন ব্যবস্থা নাই, কুঁড়ে ঘরে চামড়ার মাদুরেই তাঁহার বিশ্রাম ও শয়ন, চাকর চাকরানীহীন সংসারে নিজের কার্য তিনি নিজেই করিতেন, ছেঁড়া কাপড় ও জুতা নিজেই সেলাই করিতেন। নিজের ছাগল নিজেই দোহন করিতেন। ঘর-কন্যার কাজে আনন্দের সহিত স্ত্রীদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার জীবন এতই সাদাসিদা, সরল, সহজ ছিল যে, মৃত্যুকালে তাঁহার ঘরে উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই ছিল না, যাহা তিনি তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগের জন্য রাখিয়া যাইতে পারেন। পৃথিবীর অজস্র সম্পদের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহা সবই অকাতরে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। অত্যন্ত সংগতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাদশাহ হইয়াও তিনি যেমন নিঃস্ব ছিলেন, নিঃস্ব হইয়াও তেমন আবার তিনি বাদশাহ্ ছিলেন। তিনি অভাবী ব্যক্তি অপেক্ষাও অভাবী ছিলেন। তবুও তাঁহার সদা জাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধ অন্যের কাছে হাত পাতাকে সমভাবে ঘৃণা করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা যদি সত্যই আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভর করো তাহা হইলে যেভাবে আল্লাহ্ পক্ষীকুলকে আহার দিয়া থাকেন, তোমাদিগকেও সেইভাবে আহার দিবেন। পাখীরা সকালে ক্ষুধার্ত হইয়া বাসা হইতে বহির্গত হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফিরিয়া আসে। আবূ জর (রাযিঃ)-এর নিকট হইতে তিনি এক সময়ে ওয়াদা নিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও অন্যের নিকট হাত পাতিবেন না। এমন কি অশ্বারোহণে চলার পথে হাতের চাবুকটা যদি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহা উঠাইয়া দিবার পূর্বেই তিনি যেন তাহা নিজে উঠাইয়া নেন।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি ১০ বৎসর যাবৎ নবী করীম (সঃ)-এর সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহাকে সেবা করিয়াছেন। এ দীর্ঘ দিনের মধ্যে তিনি কোনদিন নবী করীম (সঃ)-কে সামান্য কোন রুঢ় কথা বলিতে শোনেন নাই। রসূল (সঃ)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিয়া ফেলিলেও রসূল (সঃ) কোনদিন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, কেন তিনি এমন কাজ করিলেন। আবার রসূল (সঃ) নির্দেশিত কোন কাজ না করিলেও এমন কোন সাধারণ জিজ্ঞাসাও তাহাকে করেন নাই যে, কেন তিনি তাঁহার নির্দেশিত কাজ করেন নাই।

যায়েদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি আজীবন রসূল (সঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহার সেবায় জীবনাতিপাত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না যে, তিনি রসূল (সঃ)-কে অধিক সেবা দান করিয়াছেন, নাকি রসূল (সঃ) তাহাকেই অধিক সেবা করিয়াছেন। নির্দেশিত কোন কার্য করিতে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইতেন যে, রসূল করীম (সঃ) সে কার্য পূর্বেই সমাধা করিয়া ফেলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম (সঃ) এত লজ্জাশীল ছিলেন যে, কোন পর্দানশীন কুমারীও এত লজ্জাশীলা ছিলেন না।

ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন, লজ্জা ও ঈমান একত্রে বাস করে। একটা চলিয়া গেলে আরেকটিও চলিয়া যায়।

পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অধিক নিগৃহীত ও অত্যাচারিত ব্যক্তি। পরবর্তীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং একই সাথে তিনি মানবজাতির হেদায়াতের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছেন অথচ সময়ের ফাঁকে ফাঁকে হালকা হাসি-তামাসার আনন্দ দানের মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদান ও সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টাও তিনি কম করেন নাই। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন– যাহের ইবনে হারাম নামে একজন গ্রাম্য মানুষ শাক-সবজী লইয়া প্রায়শঃ শহরে আসিতেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কিছু সব্জী উপহার দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)ও তাহাকে কিছু শহরের জিনিষ দিতেন। রসূল (সঃ) তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উক্ত লোকটা একদিন মদীনার বাজারে বসিয়া কিছু সব্জী বিক্রয় করিতেছিলেন। এমন সময়ে রসূল (সঃ) পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। তখন তিনি "আহঃ ছাড়, কে তুমি, আমার চোখ গেল" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে আড়চোখে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। তখনই তিনি লজ্জাবনত অবস্থায় রসূল (সাঃ)-এর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং এক অপার্থিব শান্তিসুধা উপভোগ করিতে লাগিলেন। রসূল (সঃ) তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই গোলামটাকে খরিদ করিবার কেউ আছে কি?" যাহের খুব কুৎসিত চেহারার লোক ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ্র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আমার মতন কুৎসিত চেহারার গোলামকে বিক্রী করিয়া আপনি লাভবান হইতে পারিবেন না। অতি সামান্য মূল্যই পাইবেন আপনি।" রসূল (সঃ) স্নেহ-মায়া মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি তো তোমার মূল্য বোঝ না দোস্ত। আল্লাহ্র নিকট তুমি অনেক মূল্যবান। তাইতো তুমি আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর কোলে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছ।" হাসান বসরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একদিন এক বৃদ্ধা রসূলে করীম (সঃ)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আমার জন্য দোয়া করুন আমি যেন বেহেশ্তে যাইতে পারি। রসূল (সঃ) বলিলেন, "দেখ বাপু বেহেশ্ত এমন জায়গা যে, বুড়ি মানুষেরা সেখানে যাইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধা তো হতাশ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার এ অবস্থাদৃষ্টে রসূল (সঃ) তাঁহার সাহাবাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। সাহাবাদিগের একজন বৃদ্ধাকে বলিলেন, "বুড়ি মা! তুমি যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে তখন তুমি আর বৃদ্ধা থাকিবে না বরং যুবতী হইয়া যাইবে। কালামে পাকে আল্লাহ্ বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত মহিলাদিগের জন্য বলিয়াছেন :

"নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কুমারী বানাইয়াছি।"

বৃদ্ধা অবশেষে রসূল (সঃ)- উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিল। বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার পাইলে সেই সাথে তাহার বৃদ্ধাবস্থা কুমারীত্বে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, এই সত্য বুঝিতে পারিয়া দুঃখবোধ তাহার ভিতর হইতে চলিয়া গেল এবং সে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। এইভাবে হাল্কা রসবোধ ও ঠাট্টা তামাসার মধ্য দিয়াও তিনি সত্যকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

–শেখ জোনাব আলী

ছোটদের পাতা

প্রশ্নোত্তরের দর্পণে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

প্রশ্ন ঃ হযরত রসূল করীম (সঃ) কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) পারিবারিক নাম এবং উপাধি কি ছিল?

উত্তর ঃ তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সঃ), পারিবারিক নাম আবুল কাসেম এবং উপাধি আমীন (বিশ্বাসী) এবং সুদুক (সত্যবাদী) ছিল।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) দাদা, পিতা, এবং মাতার নাম কি?

উত্তর ঃ তাঁর (সঃ) দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব, পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহাব।

প্রশ্ন ঃ তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা এবং শ্রদ্ধেয়া মাতা কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর ঃ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ তাঁর (সঃ) জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন এবং মাতা মারা যান তাঁর ছয় বছর বয়সের সময়।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) দুধ-মাতার নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ হযরত হালীমা সা'দিয়া।

প্রশ্ন ঃ হুযূর (সঃ)-এর বিবাহ কত বৎসর বয়সে কার সাথে হয়েছিল?

উত্তর ঃ পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত খদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যখন হযরত খদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র জীবন সঙ্গিনীদের নাম কি, কি?

উত্তর ঃ ১. হযরত খদীজাতুল কোবরা (রাঃ) ২. হযরত সওদা বিনতে যামিয়াহ্ (রাঃ) ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ৪. হযরত হাফ্সা বিনতে উমর (রাঃ) ৫. যয়নব বিনতে খোযায়মাহ্ (রাঃ) ৬. হযরত উম্মে সালমাহ্ হিন্দ বিনতে উম্মিয়াহ্ (রাঃ) ৭. হযরত যয়নব বিনতে জুহাশ (রাঃ) ৮. হযরত যুয়ায়রিয়া বিন্তে হারিস (রাঃ) ৯. হযরত সফিয়া বিন্তে হুব্বিয়া বিন আখতাব (রাঃ)। ১০. হযরত উম্মে হাবিয়া বিন্তে আবু সুফিয়ান (রাঃ) ১১. হযরত উম্মে ইব্রাহীম মারিয়া কিব্তিয়াহ্ (রাঃ) ১২. হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহেবযাদীদের (মেয়েদের) নাম কি?

উত্তর ঃ ১. হযরত যয়নব (রাঃ) স্বামী আবুল আস বিন রবি' ২. হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এবং ৩. হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) এদের উভয়ের বিবাহ আবূ লাহাব-এর দুই ছেলে যথাক্রমে উতবাহ্ এবং উতিবাহ্-এর সাথে হয়েছিল। কিন্তু রুখসতানার পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর পরে হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর বিবাহ হযরত উসমান বিন আফ্ফান-এর সাথে হয়। ৪. হযরত ফাতিমা যোহরা (রাঃ) স্বামী হযরত আলি বিন আবী তালিব।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) সাহেবযাদাগণের (ছেলেদের) নাম বলুন?

উত্তর ঃ ১. হযরত কাসেম, ২. হযরত তাহের ৩. হযরত তাইয়্যেব (যার দ্বিতীয় নাম ছিল আব্দুল্লাহ্) ৪. হযরত ইব্রাহীম (সীরাত খাতামান্নাবীঈন ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সাঃ) কত বৎসর বয়সে নবুওয়তের দাবী করেন?

উত্তর ঃ চল্লিশ বছর বয়সে।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) উপর প্রথম ওহী কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ সময়ে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ তাঁর (সঃ) উপর সর্বপ্রথম ওহী হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সামনে এসে বললেন, 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়'। তিনি (সঃ) বললেন, 'মা আনা বেকারিন' অর্থাৎ আমি তো পড়তে পারি না। ফেরেশ্তা তাঁকে নিজ বুকের সাথে বুক মিলালেন এবং বললেন, 'ইকরা' কিন্তু তিনি আগের মত জবাবই দেন। তিনি দ্বিতীয় বার একই কাজের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন, 'ইকরা' কিন্তু তিনি (সঃ) প্রথমোক্ত উত্তরই দিলেন। এই অস্বীকৃতির একটা কারণ তো এই ছিল যে, তিনি (সঃ) পড়তে জানতেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর অন্তরে এই ভয়ের সৃষ্টি হল যে, এত বড় দায়িত্ব কীভাবে পালন করব? শেষে তৃতীয় বারের মত ফেরেশ্তা তাঁকে নিজ বুকের সাথে মিলালেন কিছুটা শক্তি প্রয়োগ করেন এবং বল্লেন, 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খলাক্ব'। এবার তিনি তাঁর প্রভুর নাম শুনে এ বাণীকে পৌছানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর খাতামান্নাবীঈন এবং রহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া সংক্রান্ত কোন্ সূরার কোন আয়াতে বর্ণনা আছে?

উত্তর ঃ খাতামান্নাবীঈন হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা সূরা আহযাব-এর ৪১ আয়াতে আছে। বলা হয়েছে– মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির্ রিজালিকুম ওয়ালাকির রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীঈন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে কোন (বয়স্ক) পুরুষের পিতা নহে কিন্তু সে আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন। রহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা সূরা আম্বিয়ার ১৩৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে– ওমা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামীন। অর্থাৎ, এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ) কোন কোন বাদশাহ্র নামে তবলীগী চিঠি লিখেছিলেন?

উত্তর ঃ রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস, ইরানের সম্রাট খসরু পারভেজ আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী, মিসরের বাদশাহ্ মুকাউকিশ ও বাহরাইনের আমীর মুনযের তাইমীর, গাস্সান সম্প্রদায়ের নেতা হারেস বিন আবী সামার, ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওদা বিন আলী।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর কোন কবিতার পংক্তি বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ আনান্নাবী লা কিযবু-আনা ইবনে আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ আমি মিথ্যাবাদী নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। (হুনায়নের যুদ্ধের সময় শত্রু ব্যূহের মধ্যে একাকী ঢুকতে গিয়ে তিনি এ কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করেছিলেন– অনুবাদক)।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ) কবে এবং কত বৎসর বয়সে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে যান এবং তাঁর পবিত্র রওযা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ তিনি (সঃ) ২৬শে মে, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরীতে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁর প্রিয় প্রভুর

নিকট চলে যান। তাঁকে মদীনা মনোয়ারায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর পবিত্র হুজরার মধ্যে সমাহিত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাঁর (সঃ) মৃত্যুতে হযরত হাসান বিন সাবেত (রাঃ) যে পংক্তি গাইছিলেন তা বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ কুনতাস্ সাওয়াদা লেনাযিরী-ফা আস্য়া 'আলায়কান্ নাযের-মান শাআ বা'দাকা ফালইয়ামূত-ফা আলায়কা কুনতা আহাযিরু।

অর্থাৎ ঃ হে আমার প্রিয় (সঃ) আপনি তো ছিলেন আমার চোখের পুতুলি সুতরাং আপনার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনার পরে যার ইচ্ছা সে মরুক। আমি তো আপনার মৃত্যুকেই ভয় করতাম।

প্রশ্ন ঃ হাদীস কাকে বলে?

উত্তর ঃ হাদীস হচ্ছে ঐ সমস্ত মৌখিক বর্ণনার নাম যা আঁ হযরত (সঃ) পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা, কার্য ও উপদেশের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে শায়খীনদের কী সম্পর্ক ছিল?

উত্তর ঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)-কে শায়খীন বলা হয়। এই দু'জনই তাঁর (সঃ) শ্বশুরও ছিলেন এবং খলীফাও।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ) কোন্ দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আঁ হযরত (সঃ) দশজন আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী যাঁদেরকে তাঁদের জীবদ্দশায়ই জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন তাদের নাম নিম্নরূপঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ২. হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ৩. হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) ৪. হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) ৫. হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) ৬. হযরত আবূ উবায়দাহ্ বিন আল্ জিরাহ (রাঃ) ৭. হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ৮. হযরত তালহা (রাঃ) ৯. হযরত যাবীর বিন আওয়াম (রাঃ) ১০. হযরত সাদ বিন্ আবি আক্কাস (রাঃ)।

ইয়া রব্বি সল্লে 'আলা নাবীয়েকা দায়েমান ফি হাযেহিদ্ দুনইয়া ওয়া বা'সিন সানী- (অর্থাৎ হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তোমার নবীর ওপরে আশিস বর্ষণ করো চিরস্থায়ীভাবে– এ পৃথিবীতে ও দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের সময়েও অর্থাৎ পরকালে)

(১০-১৭ জুলাই ১৯৯৭ তারিখের বদর-এর সৌজন্যে)

সংকলন ও অনুবাদ: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**, মোয়াল্লেম।

(২য় প্রচ্ছদের শান্তির বাণীর অবশিষ্টাংশ)

পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন তাহলে সেখানে ইমাম মাহদী (আঃ) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে আল্লাহ্তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

আল্লাহ্তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ কখনো দুষ্টুমিতে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টুমিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয় তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, এদেরকে আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিন। যারা শোরগোল করে উঠে যায় তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও বলুন যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবেন। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়তের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন। প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র তো এমন হবে যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়ত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এইসব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়তই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে–উদ্ধার করতে পারে। আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলেছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করছে যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানীদের মতই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছেন ? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আপনারা বড় বড় বুদ্ধিজীবী, পত্রিকার প্রতিনিধি, বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং বড় বড় সম্মানীত জ্ঞানীজন রয়েছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন এই যে, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হউন।

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ১৪-২-৯৮ তারিখের পয়গাম থেকে সংকলিত]

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG TEL
852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 59 ● 24th Issue June 30, 1998 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

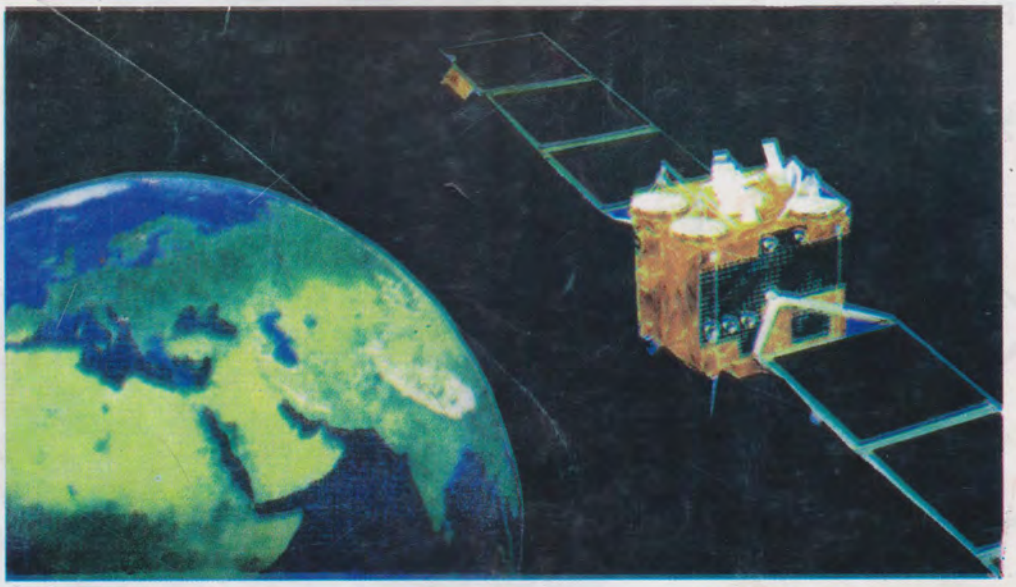

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272